পাহাড়ের চূড়ায়

(রোমাঞ্চকর শিশু উপন্যাস)

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

লীডিং বুক ডিপো
সকল রকম পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২।১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীপ্রমথনাথ গুহ

লীডিং বুক ডিপো

২।১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবন ১৩৪৩

প্রিণ্টার

শ্রীইন্দুভূষণ রায়

শশি প্রেস

১৬নং মার্কাস লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

কল্যাণীয়া—

শ্রীমতী গীতারাণী দেবীকে

অর্পণ করিলাম।

ইতি—

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য বই

১।	বঙ্কিমচন্দ্র	(জীবনী)	৶০
২।	শিবাজী	(,,)	৶০
৩।	হাজি মহম্মদ মহসীন	(,,)	৶০
৪।	ছেলেদের নেপোলিয়ন	(,,)	৶০
৫।	এ যুগের দৈত্য (বিজ্ঞানের গল্প)		৷৵০
৬।	আবিষ্কারের সাধনা (বিজ্ঞানের আবিষ্কার)		৷৵০
৭।	গুপ্তরত্ন (ছোটদের ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস)		৸০
৮।	ভূতের পুকুর (ভূতের গল্প)		৷০
৯।	লাস-কাটা ঘর (গল্প)		৷০
১০।	যাদবের যাদুবিদ্যা	(যন্ত্রস্থ)	
১১।	ছোট ডিমের মামলেট	(,,)	
১২।	ল্যাঙ্‌ড়াই আম	(,,)	
১৩।	সর্দ্দার লালসিংহ	(,,)	
১৪।	কুল্‌পী বরফ	(,,)	
১৫।	গ্যারিবল্ডি	(,,)	
১৬।	কাঠুরিয়ার মেয়ে	(,,)	
১৭।	দুনিয়ায় সেরা মানুষ	(,,)	
১৮।	ভ্যাগাবণ্ড কিং	(,,)	
১৯।	ভূতের পিণ্ডি	(,,)	
২০।	হাসির ফোয়ারা	(,,)	

উ

প

হা

র

ইতি—

সন··········

পরিচয়

নিবেদন

বিদেশে প্রত্যেক বছরই শিশুদের জন্য অনেক বই প্রকাশিত হয়। আমাদের এই অভাগা বাংলাদেশে এর একটা অভাব এতদিন ছিল। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক লেখকই শিশু সাহিত্যের উন্নতির জন্য কলম ধরিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে অনেকেই বিদেশী বই এর অনুবাদ লিখিয়া শিশুদের জন্য উপহার দিয়াছেন বা দিতেছেন।

বিদেশী বই আমার বেশী পড়া নেই। কাজেই বিদেশী বই-এর অনুবাদ করিবার মত সাহসও আমার নেই। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ফলে এই বইখানা ছোটদের হাতে তুলিয়া দিলাম। যদি বাংলার খোকা খুকুরা এই বই পড়িয়া আমোদ ও সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটুও শিক্ষা পায়, তাহা হইলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

বিনীত—

গ্রন্থকার

৯৮-৮৬

পাহাড়ের চূড়ায়

এক

—গরীব বাপ-মায়ের ছোট ছেলে আমি, মা আমাকেই ভালবাস্‌তেন বেশি। বাবা ভালবাস্‌তেন বড়দা'কে।

আমরা ছ' ভাই দু' বোন। আমিই সকলের ছোট। ছেলেবেলাকার কথা আমার এখন আব্‌ছা আব্‌ছা মনে পড়ে। আজ তোমাদের কাছে আমার ছেলেবেলাকার মাত্র দু'একটি কথা বল্‌ব। তারপর বড় হয়ে কর্ম্মজীবনে যে আঘাত পেয়েছিলেম আজ সেইটুকু ব'লেই শেষ করব।

—একদিন—

আমি তখন নীচের ক্লাশে পড়ি। দাদারা সকলেই আমার চেয়ে অনেক উঁচু ক্লাশে পড়তেন। বড়দা' ও মেজদা' পড়তেন ফার্ষ্ট ক্লাশে, আর অন্যান্য ভাইয়েরা পর পর এক এক ক্লাশ নীচে থেকে আমার বেলায় পড়ল গিয়ে ফিফ্‌ত ক্লাশ।

সময়মতই ঠন্ ঠন্ ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। মাষ্টার ম'শায়রাও যে যাঁর ক্লাশে গেলেন। আমাদের ক্লাশেও মাষ্টার ম'শায় এসে বস্‌লেন তাঁর আসনে। তিনি বস্‌তে না বস্‌তেই মাত্র এই ক'টি কথা বল্‌লেন—

"আজ ক্লাশটা এত শান্ত কেন, বিনয় আসেনি বুঝি? বিনয়টার মত অমন দুষ্টু ছেলে দুনিয়ায় আর একটি পাওয়া ভার।"

মাষ্টার ম'শাইয়ের এই কথা ক'টির কোনই প্রতি-উত্তর হ'ল না। কোন ছেলেই দাঁড়িয়ে বল্‌তে সাহস করলে না। শেষকালে আমাকেই হার মান্‌তে হ'ল। আমি আর চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পারলুম না—এক মিনিটও দেরী না ক'রে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলুম মাষ্টার ম'শায়কে—অতি বড় দুষ্টু ছেলেও শান্ত সাজ্‌তে পারে।—যাক্ ভালয় ভালয় তিনটি পিরিয়ড কাবার হয়ে গেল।

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই ক্লাশ শুদ্ধ ছেলেগুলো যে যার যায়গা থেকে উঠে পড়ল। আমি যে এতক্ষণ চুপ্‌টি করে বসেছিলেম এটা যেন কারুর ভাল লাগ্‌ছিল না।

নামটা অবশ্য আমারই ছিল বেশি, কিন্তু ক্লাশে আরও অনেকে ছিল যারা আমার চেয়েও এক কাঠী ওপরে। তবে তাদের বেলায় তত গোলমাল বাধে না, যত সব

গণ্ডগোল আমার বেলায়ই ? আমিই কি যত সব ঝগড়া-ঝাটী মারা-মারির মূল, না এর জন্যে দায়ী আরও কেউ আছে ?

"কিহে ভায়া আজ মুখখানা অমন দেখাচ্ছে কেন ?"

হঠাৎ পিছন ফিরেই দেখি যে আমাদের ক্লাশেরই প্রতুল।

প্রতুলের মুখ দিয়ে এই কথা ক'টি বা'র হওয়ায় আমি আর ঠিক থাক্‌তে পারলুম না।

প্রতুল আমার সমপাঠী। কিন্তু তার ব্যবহারে বন্ধুত্বর প্রমাণ পাওয়া যায়নি কখনও। সে-ই ছিল আমার Rival (অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী), তবে একটু পার্থক্য ছিল যে সে সব সময়ই আমাকে জব্দ করতে চাইতো। আমি কিন্তু কোনও দিন তার পাল্টা জবাব দেই নি।

বহুদিন ধরে ওকে একটু শিক্ষা দেবার মতলব আমার ছিল — অন্যদিন তার কোনই সুযোগ সুবিধা করে উঠ্‌তে পারিনি। আজ সামনের উপর একটা মস্ত বড় সুবিধা এসে পড়ায় একে আর ছেড়ে দিচ্ছি না।

—এই না ভেবে—

আমি যেন ওর কথা শুনিইনি—এমনি ভাণ করে আমার যায়গায়ই ব'সে রইলাম। আমি কোন

কথাই বল্‌ছি না দেখে ওর মুখ দিয়ে একটু মুচ্‌কি হাসি বেড়িয়ে পড়ল।—হয়ত ও ভেবেছিলো, আমি বাড়ীতে খুব মারধর খেয়েছি,—তাই আমাকে একটু শ্লেষের স্বরেই বল্‌লে—

"বেশ ছু'-এক ঘা পিঠে পড়েছে বুঝি ?"

"পড়েছে তো পড়েছে, তাতে তো-র কি হয়েছে ?" একটু রাগের মাথায় এই কথাগুলি বল্‌লাম। আমার কথা শুনে ও যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। আমার সাথে আর কোন কথা না বলেই সেখান থেকে বাইরে চলে গেল। টিফিনের সময় ক্লাশের সব ছেলেই একটু খেলায়, বেড়ায়, কেউ কেউ আবার খাবার খায়। কেউ কেউ বা বন্ধুদের সাথে গল্প জুড়ে দেয়।

—আমি হেন শান্ত ছেলেটী কিন্তু ঠায় ব'সেই আছি।

বসে্‌ বসে ভাব্‌ছি যে কী করে ওকে একটু জব্দ করা যায়। আমার মাথায় নানা রকমের বুদ্ধি এসে গজ্‌গজ্‌ করছিল। কিন্তু শেষকালে কোনটাই টিক্‌ল না। সব মতলবকে একেবারেই হটিয়ে দিয়ে শুধু একটা মতলবকেই আঁকড়ে ধরলাম। সে মতলবটা বড়ই শক্ত জিনিষ, যদিও সে আজ হয়ে উঠ্‌বে না—ছু' তিন দিন সময় নেবে। কারণ সেটা করতে হবে চালাকীর ওপর।

দুই

এক দিন দু'দিন করে প্রায় বছর কেটে গেল, প্রতুলকে আর জব্দ করা গেল না। আমার মনটাও কি ছাই একটু পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

আজ যদিও সেই প্রতিদ্বন্দীতার কথা মনে উঠ্‌লে বড্ড হাসি পায়।

যে প্রতুল আজ আমার একমাত্র বন্ধু। এমন কি সে আমার চিরসাথী। এতটা যে হবে এটা আমার ধারণায় আসেনি, যদিও একটা আকস্মিক ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রেই ওর সাথে আমার এত ঘনিষ্ঠতা হয়।

—একদিন—

আমি ক্লাশে চুপ্‌টী করে ব'সে আছি। ছাই পাশ চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদের অঙ্কের মাষ্টার ম'শায় বোর্ডে আঁক বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

আমি কিন্তু তার একটী কথাও শুনছি না। ক্লাশ শুদ্ধ সবাই বোর্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমিও যে তাকিয়ে না রয়েছি এমন নয়। কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে প্রতুলের দিকে।

"কেমন করে তাকে জব্দ কর্‌ব"

মাষ্টার ম'শায় তো তাঁর সূতোয় বান্ধা চশমা জোড়া টেবিলের উপর রেখে বোর্ডের উপর আঁক লিখে যাচ্ছেন। যখন একটা নূতন নিয়মের অঙ্ক বোঝান হয়ে গেল, তখন তিনি একটা আঁক দিলেন কষতে।

ক্লাশের মধ্যে একজনকে বোর্ডে গিয়ে সেই অঙ্কটা কষে অন্য সব ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমাদের ক্লাশে আমি ছাড়া আর কেউ সে আঁক কষতে পারবে না ভেবে মাষ্টার মশায় প্রথমটায় প্রতুলকেই বল্‌লেন অঙ্কটা বুঝিয়ে দিতে।

প্রতুলের মুখখানি তো একেবারে কালো হয়ে গেছে। প্রতুল একবার আমার দিকে আবার সেই বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সেই চাহনির অর্থ মাষ্টার ম'শায় যে বুঝ্‌তে না পেরেছিলেন এমন নয়। তাই তিনিও জোড়গলায় চেঁচিয়ে প্রতুলকে ডাক্‌লেন।

প্রতুলের তো মহাবিপদ,—তার সারা গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

এই অবসরে আমি মনে মনে একটু হেসে নিলাম। বাইরে কিন্তু ওর প্রতি—দয়াই দেখান হল।

ও আস্তে আস্তে এক পা' দু' পা' করে বোর্ডের কাছে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়াল।

মাষ্টার ম'শায়ের হাতের বেতখানা তখন লাউলতা সাপের মত লক্‌লক্‌ করে ঝুল্‌ছিল। প্রতুলের সারা গা দিয়ে ঘাম বেড়িয়ে পড়ল। এমন কি গায়ের জামা পর্য্যন্ত ভিজে গেছে। একেত' ভয়—তার ওপর লজ্জা।

ভয় ও লজ্জা দুটোই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, যেন ওকে গিলে ফেল্‌তে চায়।

সমস্ত ক্লাশটাই নীরব নিস্তব্ধ। এমন সময় মাষ্টার ম'শায়ের একটা হুঙ্কার শব্দ আমাদের ক্লাশের ঘরখানিকে যেন কাঁপিয়ে তুল্‌ল।

হঠাৎ একলাফে প্রতুল মাষ্টার ম'শায়ের হাত থেকে চক্‌খানা কেড়ে নিয়ে বোর্ডের উপর আঁক কষ্‌তে লাগ্‌ল। সে তখন মরিয়া হয়ে আঁক কষছে। কোনও দিকে তার জ্রক্ষেপ নেই। তার হাতখানি চলেছে যেন পঞ্জাব মেইল।

মাষ্টার মশায় তো অবাক। এ আবার কি কাণ্ড?

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতুলের আঁক কষা হয়ে গেল। আমরা সকলেই ঠায় বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছি, প্রতুলের ওপর আমার যে হিংসাটা এতদিন লুকান ছিল, এইবার তা আত্মপ্রকাশ করলো।

ক্লাশের মধ্যে অঙ্কে আমার সমান কেউ ছিল না। এবার দেখ্‌ছি যে প্রতুলও আমাকে ছাপিয়ে উঠ্‌ছে। একেত' ও আমার শত্রু, তার ওপর আবার পড়াশুনায়ও পাল্লা দিতে ব'সেছে, এ আর আমার সহ্য হ'ল না। আমি আর ঠিক্ থাক্‌তে পারলুম না। এক নিমেষের মধ্যেই আমার মাথায় একটা নূতন রকমের খেয়াল চেপে বসল্।

এদিকে প্রতুল বোর্ডের সাম্‌নেই ঠিক সোজাসুজি ভাবে দাড়িয়ে ক্লাশের অন্যান্য সব ছেলেদের বুঝিয়ে দিচ্ছে—যেন সেই মাষ্টার।

তার হাবভাব দেখে মনে হল যে একটা সামান্য অঙ্ক, ক্লাশের আর কেউ বোঝে নি। সেই যেন অঙ্কে গৌরীশঙ্কর।

আমি আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করে আমার পকেট থেকে একটা মারবেল তুলে নিয়ে ওর কপাল লক্ষ্য করেই ছুঁড়ে মার্‌লুম। অদৃষ্টের লিখন্, কেউ খণ্ডাতে পারে না। তাই সে মারবেল ওর কপালে না লেগে, লাগ্‌ল গিয়ে একেবারে মাষ্টার ম'শায়ের নাকের ডগায়।

—এক গুলিতেই লক্ষ্য ভেদ—।

তাই মাষ্টার ম'শায়ও মারবলের গুলি খেয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়লেন গিয়ে নীচে—

তার নাকের ডগা থেকে দর দর ধারে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল।

ক্লাশ শুদ্ধ হৈ-চৈ রৈ-রৈ পড়ে গেল, মাষ্টার ম'শায়ের রাগের মাত্রাটা সপ্তমে চড়ে উঠল। তিনিও একটা গর্জ্জন করে ক্লাশের ছাত্রদের চুপ করতে বল্‌লেন। তারপর এক এক করে সব ছেলেদের পরখ করে দেখে নিলেন—কার কার পকেটে মারবল আছে।—

ভাগ্যিস্ সেদিন আর কারুরই পকেটে একটীও মারবল ছিল না। আমার পকেট থেকেই ছোট বড় মাঝারী প্রায় দশ বারটি মারবল বেরিয়ে পড়ল। মারবল তো বের হল—শাস্তির বহরটা তখনকার মত চাপা পড়ল। হুকুমজারী হয়ে গেল যে ক্লাশ ছুটী হয়ে গেলে আমাকে কন্‌ফাইন্‌ড্ থাক্‌তে হবে।

এককান দুকান ক'রে আমার এই বেয়াদপীর কথা স্কুলময় ছড়িয়ে পড়ল। স্কুল ছুটী হয়ে গেল। সব ছেলেই চলে গেল যে যার বাড়ীতে। আমি কিন্তু ক্লাশেই বসে রয়েছি, দরজার সাম্‌নে দারওয়ান বসা। আমি যাতে পালিয়ে না যাই, তার জন্যই সে পাহাড়া দিচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল দ্বিতীয় একটী লোকও দেখ্‌তে পেলাম না। যখন সন্ধ্যে হয় হয় তখন আমাদের

হেড্-মাষ্টার ম'শায় ও সেই বুড়ো টাক্ওয়ালা অঙ্কের মাষ্টার ম'শায় এসে হাজির হলেন আমার কাছে।

আমিও তখন প্রাণপণ চেষ্টা কর্ছিলাম সেখান থেকে পালিয়ে যাবার একটা কিছু উপায় ঠিক্ করতে। দারওয়ান বেটাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম—যদি না সেই সময় মাষ্টার ম'শায়েরা এসে পড়তেন।

যাক্ যা আছে বরাতে তাই হবে।

—এই না ভেবে—

আমি হেড্মাষ্টার ম'শায়কে সব কথা খুলে বল্লাম। হেড-মাষ্টারের সাম্নে দাড়িয়ে কথা বলে কার সাধ্য, আমাদের স্কুলে এমন ছেলে খুব কমই ছিল যে তার মুখের ওপর কথা বল্তে পারে।

তিনি ছিলেন এক কথার লোক, তাই আমাকে কঠিন শাস্তি দেবার কথা বলে চলে গেলেন সেখান থেকে।

আমি একবার মাত্র তাকিয়ে দেখ্লাম আমাদের অঙ্কের মাষ্টার ম'শায়ের মুখের দিকে, তাঁর নাকটা তখন ব্যাণ্ডেজ করা।

সে এক অপরূপ মূর্ত্তি।

একেত তার মাথায় এক গাছিও চুল নেই। তার ওপর এখন নাকের ডগায় ন্যাকড়া জড়ান। এমন কি তখন

তার মুখ দিয়ে কথা বের হবারও উপায় নেই। কাজেই তিনি লেগে গেলেন তার কাজে।

—সপাং সপাং করে আমার গায়ে পিঠে হাতে—সব যায়গায়ই পড়তে লাগ্‌ল বেতের বাড়ি। কয়েক ঘা পিঠে পড়তেই আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলুম না, একেবারে নীচে চেতনাশূন্য অবস্থায় পড়ে রইলুম। নীচে পড়ে যাওয়ার পরও আরও কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন। আমার দু' চোখ বেয়ে অজস্র ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না।

এই ভাবে কিছু সময় কেটে যাওয়ার পর যে কি হল কিছুই জানিনা। আমি পড়লাম অজ্ঞান হয়ে, যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন চোখ মেলে চেয়ে দেখি যে আমার শিয়রে বসে বাতাস করছে আমারই একমাত্র শত্রু প্রতুল। তার একখানি হাত আমার মাথার ওপর আর এক হাত দিয়ে আমাকে বাতাস দিচ্ছে।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি যেন আমাকেই হারিয়ে ফেল্‌লাম। এ কি?

—এ যে প্রতুলদেরই বাড়ী—

সুন্দর অথচ সুসজ্জিত ঘরখানি। গদিতে আঁটা বিছানা। এ রকম বিছানায় শোয়া আমার ভাগ্যে সেই দিনই প্রথম ঘটেছিল।

প্রতুলের হাতখানি খুব শক্ত করে চেপে ধরে বল্‌লাম যে "ভাই, আমাকে ক্ষমা করিস্‌, আজ হতে আমি তোর বন্ধু।"

আমার মুখ দিয়ে এই কথা ক'টি বের হবার আগেই ও আমায় বলে ফেল্‌লে "ভাই, এখন ও সব কথা রেখে দে। যাতে করে একটু সুস্থ হতে পারবি, তাই কর। তোর মা ও বাবা এতক্ষণ এখানেই ছিলেন। এইমাত্র তারা খেতে গেছেন, আবার এখনই এসে পড়বেন। আমি তো তোকে কখনও মন্দ চোখে দেখি নি। বরাবর বন্ধু ভাবেই দেখে এসেছি। আজ কেন ও সব বাজে কথা বল্‌ছিস্‌।"

তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। সে শুধু ওরই শুশ্রূষা ও দয়ার গুণে। —সেই হতেই প্রতুল আমার বন্ধু। এমন কি সে বন্ধুত্ব চিরকালের জন্য ঠিক সমান ভাবেই ছিল। একদিনের জন্যও মনে কেউ কোন দুঃখ পাইনি।

তিন

সময় কারুর মুখপানে চেয়ে বসে থাকে না। তাই এমনি করে আমাদেরও বন্ধুত্বর সূত্রপাতের পর থেকে প্রায়—চার বছর কেটে গেল।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমাদের জীবনের কোনই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তবে অবস্থা ও স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। আমি আর সেই দুষ্ট দুরন্ত ছেলে নই। বেশ ভাল ভাবেই ম্যাট্রিকটা পাশ করে ফেলেছি। প্রতুলও আমার সঙ্গে সঙ্গে পাশ করে কল্‌কাতায় গেল পড়তে। আমার আর পড়াশুনা হবার কোনই উপায় নেই। কারণ বাবা বুড়ো হয়েছেন, দাদারা সব বড় হয়ে বিয়ে থা করে ঘর সংসারী হয়েছেন।

কিন্তু টাকা পয়সার দিক দিয়ে সকলের ভাগ্যেই শূন্য—কেউ একটা পয়সা আয় করবার যোগাড় করছেন না। আর করবারও ইচ্ছা নেই কারও।

—তারপর—

দু' বন্ধুতে মিলেই কল্‌কাতায় গেলাম পড়তে। যাবার সময় বাবা ও মার কাছ থেকে বিদেয় নিলেম। কিন্তু সেই বিদেয় নেবার সময়কার কথা মনে পড়লে এখনও আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মা ত' কিছুতেই যেতে দিতে চাইলেন না। তবুও মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেম।

*   *   *   *   *

আমাদের বাড়ী ছিল দার্জ্জিলিং-এরই কাছাকাছি ছোট্ট একটা সহরে। সেখান থেকে দার্জ্জিলিং মাত্র চার পাঁচ মাইল দূর। বাবা চাকরী করতেন সরকারী আফিসে। তাই বুড়ো বয়সে পেন্সন নিয়ে বাড়ীতেই বসে আছেন। যে ক'টী টাকা পেন্সন পান, তাতে আমাদের পরিবারের সকলের দু' বেলা পেট ভরে খাওয়া হয় না। কোনও রকমে দিন গুজরান ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ওপর— দাদারা কেউই টাকা পয়সা রোজগাড়ের দিকে মাথা দিচ্ছেন না দেখে আমিও পড়া ছেড়ে দেব ভেবেছিলেম, কিন্তু প্রতুলের পীড়াপীড়িতে কলকাতা যাওয়াই ঠিক করেছিলেম। মনে মনে এটাও ঠিক করে ফেলেছিলেম যে

কল্‌কাতা গিয়ে যে কোন একটা চাকরী দেখে নিলেই হবে। প্রতুল যাচ্ছে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই।

—আর আমি, আমার স্ফূর্ত্তি আস্‌বে কোত্থেকে ?—

ট্রেণ চলেছে হু-হু শব্দে।

একে তো দার্জ্জিলিং মেল। তার ওপর আবার সেদিন বোধ হয় কোন এক রাজকর্ম্মচারী যাচ্ছিলেন কল্‌কাতায়। তাই কোন' ষ্টেশনেই ট্রেণ থাম্‌লে না। সরাসর কল্‌কাতায় থাম্‌বেন বলে মতলব আঁটছিলেন।

—কিন্তু একি ?—

"হঠাৎ মাঝপথে ট্রেণটা থেমে গেল কেন ?"

প্রতুল এই কথা ক'টি আমাকে ব'লে জানালা থেকে মুখ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌লে। আমিও ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। বেশ আরাম করে শুয়ে পড়েছিলেম। যদিও সে আরামটা ছিল বাইরের লোকদেখান। মনটা কিন্তু আমার পড়েছিল আমাদের সেই কুড়ে ঘরখানির কোণে—আমার গরীব বাবা ও মায়ের চোখের জলের দিকে।

এইবার বুঝতে পারলাম, একটা কিছু আকস্মিক বিপদ হয়েছে। না হ'লে ট্রেণের প্রায় সকল লোকই বাইরে নেমে পড়বে কেন ? আমরা দু'বন্ধুতেই বাইরে

দেখে নেব ভেবে—পা বাড়াতে যাব, এমন সময় আমরা দেখতে পেলাম—প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই একটা গাড়ীর দরজার সাম্‌নে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কেউ ভেতরে ঢুকে দেখতে পার্‌ছে না। কি যে হয়েছে, কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারলেম্‌ না। কোনও লোকের মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হচ্ছে না—সকলেই চুপ্‌ চাপ।

মিনিট পনের পরে ভীড়টা একটু কম্‌ল। প্যাসেঞ্জাররা যে যার কামরায় গিয়ে উঠ্‌ল্‌। আমরাও তাদের কাছ থেকে কারণটা জেনে নিলুম। একজন প্যাসেঞ্জারের বুকে ছোরা বসিয়ে কে যেন সরে পড়েছে। তার কাছে নাকি অনেক টাকা ছিল। যে লোকটি খুন করেছে সে চলন্ত ট্রেণ থেকে নেমে পালিয়ে গেছে। তাকে অনেকে দেখেছে কিন্তু কেউ ধরতে পারেনি।

অল্প কিছু সময় পরেই ট্রেণ আবার চল্‌লো। এবার তার গতি বাড়িয়ে দিল ঠিক পুরামাত্রায়।

আমরা দু'জনেই ঠিক যায়গামত বসেছি। প্রতুলের তো কথাই নেই। তার তো আর কোন চিন্তা ভাবনা নেই। সে বড় লোকের ছেলে।

আমার মনে পড়ে গেল আমার সেই ছেলে-বেলাকার কথা। কত সব ছাই পাশ চিন্তায় আমার মনখানা ভরপুর। এর আগে যে লোকটীর ছুর্দ্দশার কথা শুনেছিলেম, তার কথাও মনে পড়ল।—

যাক্ আমাদের সঙ্গে তো আর টাকা পয়সা নেই, সামান্য কয়েকটা টাকা অবশ্য ছিল। আমাদের আর খুন করতে যাবে কেন?

এই সব সাত পাঁচ ভাব্‌ছি, এমন সময় আমার দৃষ্টি গেল আমাদেরই কামরার অপর একজন লোকের প্রতি। সেই লোকটী একটী সিগারেট টান্‌ছে, আর এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছে। ওর তাকানর ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল যেন ওকে কেউ ধরে ফেলবে এই ভেবে কেবলই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখ্‌ছে! ওর হাব ভাব দেখে আমার যেন কেমন সন্দেহই হ'ল।

প্রতুলকে দেখিয়ে দিলাম। সে কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইলে না।

আমি আর বসে থাক্‌তে পারলাম না। সেই লোকটীর কাছে গিয়ে তার সাথে আলাপ করে বুঝে নেব

ভেবে যাই সেখানে বস্‌ব, এমন সময় সেই লোকটী ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

এর পর সেদিন আর কোন ঘটনা ঘটেনি। যথাসময়ে কল্‌কাতা পৌঁছা গেল।

চার

একদিন দু'দিন করে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। কল্‌কাতা সহরে হ্যারিসন রোডের একটা মেসে আমরা বেশ সুখেই কাটিয়ে দিলেম।

—একদিন—

সকাল বেলায় লজিকের নোট্‌টায় এক রকম চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের পাশের রুমের মাখমবাবু এসে হাজির এবং সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লেন—

"এবার গরমের ছুটীটা কি এখানেই কাটিয়ে দিবেন? না দেশে টেশে যাবেন কোথায়ও।"

"এই যে মাখমবাবু! বসুন। এতক্ষণ আপনার কথাই ভাব্‌ছিলেম।"

—এই কথা কয়টী বলে বইখানা রেখে পড়াকে খতম করে দিলাম।—

ছুটীর দিনে একটু গল্পই করা যাক্।—

কিছুক্ষণ ধরে মাখমবাবুর সঙ্গে বেশ আলাপ চল্‌ছিল। কিন্তু হঠাৎ কোথা হ'তে একজন অপরিচিত লোক এসে আমাদের গল্প গুজবের রসভঙ্গ ক'রে দিলে। তাড়াতাড়ি

সে লোকটীকে বিদেয় দিতে চাইলেম। লোকটী কিন্তু যাওয়া তো দূরের কথা—আরও ব'সে পড়্ল। সেই ভদ্রলোকেরই কোন এক বন্ধু আমাদের মেসে থাকৃত, তাও আবার কোন্ কালে কে জানে ?

আমাদের যেন সন্দেহ হ'ল যে এ লোকটা সুবিধের নয়। নিশ্চয়ই কোন একটা কুমতলবে এসেছে। তা না হ'লে নিতান্ত অপরিচিত হয়েও বসে পড়ল কেন ?

সে ভদ্রলোক নিজে নিজেই তার পরিচয় দিয়ে নিলে। তারপর কত সব আজগুবি গল্প আরম্ভ করে দিলে। আমাদের অস্বস্তির মাত্রাটা ক্রমেই বেড়ে চল্‌লো। তার কথা শুনেও যেন শুন্‌ছি না।

ঘণ্টাকয়েক কেটে গেল। আমি তো চুপ করেই রইলাম। মাখমবাবুই এতক্ষণ কথা বল্‌ছিলেন। শেষকালে মাখমবাবু উঠে গেলেন তার রুমে। মাখমবাবু চলে যাওয়ার পরেও সে ভদ্রলোক যাচ্ছে না দেখে আমি এইবার বই পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব, কারুর মুখ দিয়ে কোন কথা নেই।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম বিছানার ওপরেই। আচম্‌কা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি, চেয়ে দেখি যে প্রতুলই আমাকে ধাক্কা দিয়েছে।

সে আমায় ইসারায় বলে দিলে যে এই ভদ্রলোক সুবিধের লোক নয়। একে সে যেন কোথায়ও দেখেছে। আমার কানে কানে বলে গেল এর ওপর নজর রাখ্‌তে, এক ভদ্রলোককে তো আর গায়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়ান যায় না। সেটাও তো অভদ্রতা। প্রতুল আমাকে বলে দিয়ে চলে গেল তার রুমে। আমি পড়লাম মহা মুস্‌কিলে।

আমি না পারি বই-এর মধ্যে মন দিতে, না পারি সে ঘর থেকে অন্য কোথায়ও যেতে।

—"আচ্ছা তবে আসি, নমস্কার।"—

এই বলে সেদিনকার মত বিদায় নিলে সেই ভদ্রলোক। আমিও সেই সময় তার পিছন পিছন একেবারে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত গেলাম। লোকটার হাবভাব দেখে ওকে বেকার বলে মনে করা ছাড়া আর কোনই উপায় নেই দেখে আবার আমার ঘরেই ফিরে এলাম।

ফিরে এসেই প্রথমে আমার নজর পড়ল আমার জুতা জোড়ার দিকে। দু'দিন আগে যে জুতা কিনে এনেছিলাম, সেই জুতা জোড়া গেল কোথায়?

সারা মেসটা তন্ন তন্ন করেও যখন কোথাও পেলাম না, তখন আর বুঝতে বাকি রইল না ঐ লোকটাই আমার

জুতা জোড়া চুরী করে নিয়েছে। চোখের সাম্‌নে থেকে চুরী করে নেয়া, তবে সে কি রকম চোর তা সহজেই অনুমেয়।

ছেলেবেলায় আমাকে সকলে ভয় করত, আর আজ কিনা আমার চোখের সাম্‌নে দিয়ে আমারই জুতা নিয়ে চ'লে গেল। আমি হাতে পেয়েও ধর্‌তে পারলাম না। আমি একেবারে বোকারাম সেজে গেলাম, মনে মনে একচোট কেঁদে নিলেম, বোধ হয় সে কান্নার সুরটা ভগবানের কানেও পৌঁছেছিল।

গরীব বাপ-মায়ের চিন্তায়ই না আমাকে এই রকমটা বোকা বনিয়ে তুলেছে।

কিসের জন্য আমার চিন্তা? আমার ওপরে আরও অনেক ভাই রয়েছেন। তাঁরা কেন আমার গরীব বাপ মায়ের দিকে তাকান না? তাঁরা ইচ্ছে করলেই তো আমাদের সকলের দুঃখ ঘোচাতে পারেন।

আমারই বা মাথা ব্যথা কেন? দাদারাই তো বুড়ো বাপ মায়ের সুখ-দুঃখের ভাগী। আমি ছোট ভাই, আমি থাক্‌ব দাদাদের আদর যত্নে স্নেহের ক্রোড়ে।—

যাক্ ছুটী হ'তে না হ'তেই ছুটে গেলাম বাড়ীতে।

কল্‌কাতা সহরে শত প্রলোভনের মধ্যেও থেকে থেকে আমার মনটা পড়ে থাক্‌ত আমার জন্মভূমির প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে।

কতক্ষণে যেয়ে মার কোলে আশ্রয় নেব, তার জন্যই পাগল হয়ে উঠ্‌তাম। প্রতুলও আমার সঙ্গে গেল। তার মনের অবস্থা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারতাম না।

কারণ সে ছিল বড় লোকের ছেলে। তার বাপের অগাধ পয়সা, কত দাস দাসী, কত লোকজন তাদের বাড়ীতে অহরহ খাট্‌ছে। ওর বাবা ওর জন্যে অজস্র টাকা ব্যয় করতেন। যদিও আমি ওর দয়ায় কল্‌কাতা থেকে পড়াশুনা কর্‌ছিলেম।

পাঁচ

"বিনয়! এবারকার ছুটীটা কি এমনি ক'রেই কাট্‌বে? একটা কাজ করলে হয় না। বাড়ীতে বসে না থেকে চল্‌না অমবা দু' বন্ধুতে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায় যাব প্রতুল?"

"এখন আমরা বড় হয়েছি, আমাদের তো আর ভয় ভাবনা নেই। চল্‌না একটু পাহাড় থেকে বেড়িয়ে আসি।"

"পাহাড়ে যাব! পাহাড়ে তো অনেক জন্তু জানোয়ার থাকে, সে সব জানোয়ারের পাল্লায় পড়লে কি আর প্রাণে বেঁচে আস্‌তে পারব?"

"দেখ্‌ বিনয়! তোর মুখ দিয়ে ওসব কথা বলা শোভা পায় না। তুই না ছিলি এই সহরের সেরা দুরন্ত ছেলে, আর আজ এত মুস্‌ড়ে পড়েছিস্‌ কেন? তোকে কি ভূতে পেয়েছে নাকি?"

প্রতুলের কথা শুনে আমার সাঁরা গা দিয়ে রক্ত বয়ে যেতে লাগ্‌ল। পাহাড়ে বেড়াতে যাব তাতে আবার ভয় কিসের?

প্রতুলকে বল্‌লাল—"বেশ যাবো, কবে যাবে ঠিক করে ফেল।"

প্রতুল আমার কাছ থেকে জবাব পেয়ে সেই দিনই সব ঠিক করে ফেল্‌লে।

পর দিনই বেলা হু'টার সময় আমরা হু'বন্ধুতে রওয়ানা হলুম পাহাড়ে বেড়াতে।

* * * *

আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় ৩।৪ মাইল পায়ে হেটে যেতে হয়। তারপর কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়। ছোট ছোট পাহাড়গুলি যেন সার বেঁধে পাশাপাশি মিতালী পাতিয়ে নিয়েছে। তারই পাশ দিয়ে আবার একটা বড় এবং উঁচু পাহাড় ঠিক সোজাসুজি ভাবে মাথা উঁচু করে আছে। সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটী রেল লাইন ঠিক বরাবর পূবদিক দিয়ে গিয়ে একেবারে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত গিয়ে মিশেছে। ট্রেণে আমরা অনেকবার দার্জ্জিলিং গিয়েছি, কিন্তু পাহাড়ের ওপরে উঠি নাই কোনও দিন।

আজ আমাদের মনে কত আনন্দ! পাহাড়ের দৃশ্য এমনই সুন্দর যে সেখানে একবার গেলে আর ফিরে

আসতে ইচ্ছে করে না। তবে জন্তু জানোয়ারের পাল্লায় পড়লে সেখানেই প্রাণটাকে রেখে আস্‌তে হয়।

যাক্ আমরা যখন এক পাহাড় হ'তে আর একটা পাহাড়ে পা দেব, তখন সূর্য্যদেব তা'র রঙিন থালাকে বিস্তার করে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার মতলব আঁটছিলেন।

প্রতুল বল্‌লে—"ভাই, রাত হয় হোক, আজ আমরা এই পাহাড়ের কোনও গুহায় রাতটা কাটিয়ে কাল ভোরের বেলায় ঘুরে দেখে নেব।"

প্রতুলের কথার পাল্টা উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা, আমারও মতলবটা ছিল সেই রকমেরই একটা কিছু। আমিও তাই বল্‌লাম যে এই সন্ধ্যার সময় খানিকটা পায়চারী করেই দেখি না। তারপর একটা আস্তানা খুঁজে নেয়া যাবে।

তখন পর্য্যন্তও সন্ধ্যা হয় নি। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর কোন জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেলাম না। সোজাসুজি ভাবে হাট্‌তে সুরু করে দিলাম। মাঝে মাঝে ২।১টা বড় বড় গাছ যেন আকাশের সঙ্গে মিশেছে।

কোনও রকমের পশুপক্ষী কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। মনে মনে ভগবানকে একটা ধন্যবাদ না দিয়ে আর পারলুম না।

"কি সুন্দর যায়গা এটা, বোধ হয় পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, সবগুলোকেই জড় করে রেখেছে এখানে। গাছ-পালাগুলিও ঠিক যেন বেশ সাজান গোছান।"

প্রতুলের কথা যেন আমার কানে গেল না, কারণ আমি দেখ্‌ছিলাম একটা কিছু আশ্রয়ের জন্যে।

হঠাৎ প্রতুল উঃ বলে একটা চীৎকার পাড়লে। একটা বড় কাঁকড়া তাকে কামড়ে ধরেছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কারুরই নজড়ে পড়ে নাই এই অদ্ভুত জীবগুলির দিকে।

পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে এক একটা ফাটল, সেই ফাটলের ভেতর থেকে ছোট বড় অনেকগুলি কাঁকড়াই বাইরে বেড়িয়ে পড়েছে, তারা যেন ঠিক সার বেঁধে কোথায়ও অভিযান সুরু করে দিয়েছে। আমি যেই সেই কাঁকড়াটাকে ছুড়ে ফেলে দেব, অমনি আরও কতকগুলি কাঁকড়া একত্রে আমাদের গিল্‌তে আস্‌ছে। আমরা দু'জনে দৌড়ে সে যায়গা থেকে দূরে পালিয়ে গেলাম।

একটা বড় রকমের গাছের গোড়ায় বসে' একটু জিড়িয়ে নেব ভেবে যেই বস্‌তে যাব অমনি গাছের উপর হ'তে কিচির মিচির শব্দ শুন্‌তে পেলাম। ওপর দিকে তাকিয়েই দেখি—অনেকগুলো বানর গাছের উপর আস্তানা গেরে বসে আছে।

সেই বানরগুলোকে ভয় করলে চল্‌বে কেন? কত রকমের বড় বড় জন্তু জানোয়ারের সাম্‌নে দিয়ে আমাদের পথ করে নিতে হ'বে, আর এতো সামান্য বানর।

"—বানর নাকি মানুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল কোনকালে—"।

গাছের নীচে একটু বিশ্রাম করে কোথায়ও একটা আস্তানা খুঁজে নেব ভেবে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেম। প্রতুলও আর একটা সিগারেট ধরালে। এমন সময় কে যেন হঠাৎ আমাদের ২জনের হাত থেকে সিগারেট দুটোকেই কেড়ে নিয়ে গেল।

পিছন ফিরে চেয়ে দেখি যে দুটো বানর নীচে থেকে গাছের ওপরে লাফিয়ে উঠে পড়্‌ল। গাছের ওপরের ডালে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যে কিচির মিচির বল্‌ছে আর সেই সিগারেট দুটো টান্‌ছে। ঠিক আমরা যেমন হাতে করে মুখে পুরে সিগ্রেট ধরাই' ওরাও আমাদের

মত করে টান্‌ছে, আর মুখ থেকে ধোয়া বের করে দিচ্ছে।

"বাঃ কি চমৎকার জীব এই বানরগুলো! মানুষকে অনুকরণ করতে পারে, এমন বোধ হয় আর কোনও জীব নেই।"

প্রতুলের কথা শুনে আমার বড্ড হাসি পাচ্ছিল। তাই আমিও ওকে বল্‌লাম—"তুমি বোধ হয় জীবনে কখনও বানর দেখনি। বানরের যেমন গুণ, তেমনি বুদ্ধি। ওরা বুদ্ধির জোরে মানুষ তো কোন ছার, বলবান পশুকেও হার মানিয়ে তবে ছাড়ে।"

আমরা আর সিগারেট খাওয়া তো দূরের কথা সেই যায়গা হতেই উঠে রওয়ানা হলাম অন্য কোথায়ও আশ্রয় নেবার জন্যে।

প্রায় আধমাইল খানেক হেটে একটা যায়গায় এসে আমরা উভয়েই থমকে দাড়ালাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, এমন কি রাতের ঘনান্ধকার এসে আস্তে আস্তে পৃথিবীর ওপর বিস্তার করেছে।

একখানি ছোট্ট কুটীর। সেই কুটীরখানি বন্য লতাপাতায় ঘেরা, ওপরের ছাউনিও খরের। ঘরখানির

মধ্যে বা চারপাশে কোনও রকমের জনপ্রাণী থাকে বলে মনে হয় না।

কারণ এপাশে ওপাশে ছু' চারটা আগাছার ডালপালাও ঘরের চারপাশের দেওয়ালের গায়ে এলিয়ে পড়েছে। হয়ত তারা তাদের ঋণ শোধ করবার জন্যেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

প্রতুল থম্‌কে দাড়াল। ঘবের ভেতরে ঢুকতেও সাহসে কুলাচ্ছে না দেখে আমিই হন্ হন্ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। অন্ধকারের মধ্যে আর কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। তবে কোনও কিছু একটা প্রাণীর শ্বাস প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ আমার কানে গেল। টর্চ্চও আমার কাছে নেই। বাইরে বের হ'য়ে প্রতুলের কাছ থেকে একটা দেশলাই নিয়ে আবার সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলাম, দেশলাই ধরিয়ে যা দেখ্‌লাম তাতে আমাদের মনে আনন্দ তো দূরের কথা আরও একটা ভয় ও বিস্ময় এসে অধিকার করে বস্‌ল।

একটী লোক হাতা পা বান্ধা অবস্থায় সেই ঘরেরই এক পাশে পড়ে রয়েছে। সেই ঘরের মধ্যে আসবাব পত্র কিছুই নেই, এমনকি একটী মাতুর পর্য্যন্ত নেই, তবে ছু' তিনটী মরার মাথা পড়ে রয়েছে।

একটার পর একটা করে গোটা দেশলাইটাকে প্রায় শেষ ক'রে ঘরের প্রত্যেক জিনিষটা তন্ন তন্ন করে দেখে নিলাম। কোথায়ও কোন আলো টালো আছে কি না? বাইরে এসে প্রতুলকে সব কথা খুলে বল্‌তেই, চট্‌পট্‌ আমরা দুজনে একত্রে ঘরের ভেতর থেকে সেই লোকটাকে বাইরে নিয়ে এলেম।

জ্যোস্নালোকে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছিলাম। এ দিকে প্রতুল সেই বন্ধনগুলো কেটে দিচ্ছিল।

সেই ভদ্রলোক কিন্তু আমায় দেখে আর চোখের জল চেপে রাখ্‌তে পারলে না। একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ফেল্লে। পরে বন্ধন হ'তে মুক্ত পেয়ে একেবারে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। আমার পা দু'খানিকে এমন ভাবে জাপ্‌টে ধরেছে যে আমি আর কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না।

দু' ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল আমার পায়ে। আমি তাকে ধরে উঠাতেই কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্‌লেন—

"বিনয় বাবু আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি ঘোরতর পাপী। একদিন অন্যায় করেছি, আর তার প্রতিফল আমি পেয়েছি! কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে আপনাকে আমার

দেবার কিছুই নেই, বরং আমি আগে থেকেই আপনার কাছে অপরাধী। আজ আমি চাই শুধু একটু ক্ষমা। আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।”

এই কথা ক'টী বলে আর কিছুই বল্‌তে পারলে না। মুখখানি তা'র জড়িয়ে এল। প্রতুল আমার কাছেই দাড়িয়েছিল। ও যে কি বল্‌তে চায় তার কাণাকড়িও বুঝ্‌তে পারলাম না।

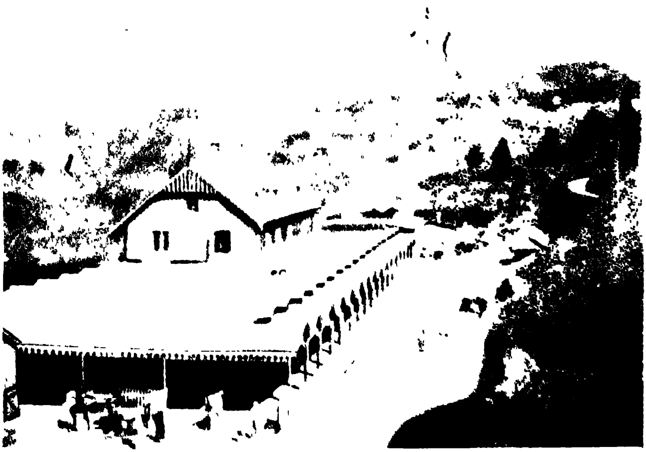
প্রতুল একটা দেশলাই-এর কাঠি ধরিয়ে ভদ্রলোকের মুখের কাছে ধরতেই আমার আর বুঝতে বাকী রইল না যে এ লোকটী কে? কেনই বা আমার পা' ধরে কাঁদছে? এক মুহূর্ত্তের ভেতরেই মনটাকে ঠিক করে ফেলে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরে বল্‌লাম—

“বন্ধু, সে কি? একদিন ভুলের বশে যা করেছ ত করেছই, সে চুকে গেছে, এখন এস, আজ হতে তুমিও আমাদের বন্ধু। এই পাহাড়ের ওপর তোমাকে পেয়েছি তোমাকে আর ছেড়ে দিতে পারব না।”

“বিনয়! একে যেন কোথায় দেখেছি বল্‌তে পারিস্? আমার যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।”

প্রতুলের কথা শুনে আমি পড়লাম এক মহা মুস্কিলে। এ ভদ্রলোকের নাম তো আমি জানি না। তবে কি সূত্রে





[illegible]

তাঁকে চিন্‌তে পেরেছি সেটা প্রতুলের কাছে বল্‌তে গেলে হয়ত মনে মনে তিনি খুব লজ্জা পাবেন। আর না বলেই বা করি কি? তাই প্রতুলকে বল্‌লাম—

"তোর মনে পড়ে কি? সেই যে আমার জুতো চুরি হয়েছিল কল্‌কাতার মেস থেকে।"

"ওঃ বুঝ্‌তে পেরেছি। আর বল্‌তে হবে না। আপনার নাম অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নয় কি?"

"হ্যাঁঃ"

"কবে জেল থেকে বেরিয়েছেন?"

"এই দশ বার দিন হল।"

"এতদিন কোথায় ছিলেন?"

"জেল থেকে বা'র হবার পর পথে পথে ঘুরে বেড়াই। দু'দিন অনাহারে কাটিয়েছি। শেষে তিন দিনের দিন একটা লোকের কাছে ভিক্ষে চাইতেই, সেই লোকটী আমায় নিয়ে এল এই পাহাড়ে। পাহাড়ে এসে পৌঁছেই সেই লোকটী আমার হাত পা খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল্লে। তারপর গাছের লতা দিয়ে সারা গায়ে বেঁধে রেখে দিলে ঐ ঘরখানির মধ্যে। তিন দিন কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। একে তো আমি দু'দিন অনাহারে মৃতপ্রায়। তার উপর আরও তিন দিন। কাজেই আমার

আর নড়বারও শক্তি রইল না। ঠিক মরা মানুষের মত প'ড়ে রইলাম। তিন দিনের দিন রাত্রে একটা মশাল হাতে করে এক জটাজুটধারী বলিষ্ঠ বিরাট বপু আমার মুখের সাম্‌নে কতকগুলি ফল রাখ্‌লে, কিন্তু আমি খাব কেমন করে? তাই সে-ই আমাকে একটু একটু করে খাইয়ে দিলে। পরে একটা মরার মাথায় করে খানিকটা জল আমার মুখের সাম্‌নে ধরতেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লুম, তারপর যে কি হয়েছে, আমি কিছুই জানি না। জ্ঞান হওয়ার পর চেয়ে দেখি যে অন্ধকারের মধ্যে আমি সেই একই যায়গায় একই ভাবে প'ড়ে রয়েছি।"

এই কথাগুলি বলে সে থাম্‌ল। তার মুখ দিয়ে আর কোন' কথাই বের হচ্ছে না দেখে আমরা উভয়েই এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে দেখ্‌ছিলাম, কোথায়ও কিছু দেখা যায় কিনা।

কিছুক্ষণের জন্য আমরা তিন জনেই নীরব, হঠাৎ প্রতুল আমার হাতখানি ধ'রে মা'রলে এক টান,—সে টানের চোটে আমার হাতখানি ছিঁড়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল আর কি!

আচমকা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও রকমের চিন্তা ভাবনা করবার সময় না দিয়ে প্রতুল

আমাকে টেনে নিয়ে চল্লো—আর একটা ইসারায় সেই লোকটীকেও ব'লে দিলে পালাতে।

আমরা তিন জনেই দৌড়ে যাচ্ছি বটে কিন্তু কিসের ভয়ে যে পালাচ্ছি, তা জান্‌বার অবসরও আমাদের নেই। কিছুদূর গিয়ে একটা গাছের গোড়ায় আমরা তিন জনেই থমকে দাঁড়ালাম। পিছন ফিরে চেয়ে দেখি যে এক জটা-জুটধারী সন্ন্যাসী সেই ঘরখানির মধ্যে ঢুক্‌ল। তার হাতে একটা মশাল। মশালের আলোতে বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল—এই সন্ন্যাসীই অমরকে বেঁধে রেখেছিল।

"বিনয়! এই গাছটার ওপরে উঠে দেখা যাক্, ও কি করে? না হলে হয়ত আমাদের ধরে ফেল্‌বে।" প্রতুলের কথা শুনে আমরা তিন বন্ধুই চট্‌পট্ গাছে উঠে পড়লুম।

রাতের অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। একটা মশালের আলোতে এতক্ষণে তবুও সন্ন্যাসীর চেহারাটা দেখ্‌তে পেরেছিলাম, এখন সেটাও দেখা যাচ্ছে না।

খানিকক্ষণ আমরা চুপ করে রইলাম। কারুর মুখ দিয়ে কোনও কথা নেই। ঝুপ্ করে একটা শব্দ হওয়ায় আমরা তিন বন্ধুই চম্‌কে উঠ্‌লাম। গাছের ওপরে একটা পাখী এসে উড়ে পড়ল।

"ভয় নেই—ওটা তো একটা পাখী। আমাদের সাম্‌নে যে বিপদ, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পারলে শেষে পাখীটাকে দেখে নেওয়া যাবে।"

প্রতুলের কথার পাল্টা জবাব না দিয়ে আর থাক্‌তে পারলুম না। "পাখী হয়েছে, তাতে কি? আমরা যে নিরস্ত্র, একটা সামান্য পাখীর কাছেও যে আমাদের ঘায়েল খেতে হবে। সাম্‌নে বিপদ তো আছেই। সন্ন্যাসী আমাদের কি করবে?" অমর এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, এইবার বল্‌লে—"ভাই তোমাদের কাছে কোনরূপ অস্ত্র শস্ত্র দেখ্‌ছিনা। আমার কাছে একখানি ছোরা আছে। সেই ছোরাখানা আমি এই পাহাড়েরই একটা যায়গায় রেখেছি। সন্ন্যাসী যখন আমাকে ধরে নিয়ে এল, তখন আমি আমার ছোরাখানাকে একটা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে এসেছিলাম। প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম যে এই সন্ন্যাসীকে শেষ করে দেই। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকালে কারুরই সাধ্য নেই যে ওর গায়ে ছোরার ঘা দেয়। ছোঁয়া তো দূরের কথা, বোধ হয় কামানের গোলাগুলিও পিছু হটে। আমার বাম হাতখানি ধ'রে খুব জোড়ে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাচ্ছিলো, ডান হাত দিয়ে কোমর থেকে ছোরা তুল্‌তে যাবো, কিন্তু আর তুল্‌তে পারলুম না। সেই যায়গায়ই প'ড়ে রইল।

তখন আমি একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আগাছার ঝোপের মধ্য দিয়ে হাট্‌তে আমার কষ্ট হচ্ছিল খু-ব, কিন্তু সন্ন্যাসী ব্যাটার সে দিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর গায়ে এত শক্তি যে আমাদের তিনটে লোককে এক হুঙ্কারে মেরে ফেল্‌তে পারে। আজ রাতটা কোনও রকমে কাবার করে দিতে পারলে কাল একবার খুঁজে দেখ্‌ব সেই ছোরা খানা পাওয়া যায় কিনা।"

এই কথা ক'টা বল্‌বার পর আর কোনও কথা বলবার আগেই আমাদের সকলেরই চোখ পড়্‌ল সেই সন্ন্যাসীর জ্বল্‌জ্বলে চোখ দু'টার দিকে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বেড়িয়ে আস্‌ছে। আমরা তো কোন্ ছাড়্ সেই পাহাড়ের সমস্ত গাছপালাগুলোকেও পুড়ে ছাই করে দেবে।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম—

কিন্তু ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। প্রতুল ঠায় সেই দিকেই চেয়ে রইল।

মশালের আলোর সাহায্যে চারদিকে একবার দেখে নিয়ে যখন কোথাও কিছু দেখতে পেলে না, তখন খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে ফেলে ঠিক সোজাসুজি আমাদের দিকেই এগুতে লাগল।

সন্ন্যাসীকে আমাদের দিকে আস্‌তে দেখে অমর আস্তে আস্তে পা টিপে গাছের আগডালে গিয়ে উঠ্‌ল।

আমি ও প্রতুল চুপ্‌টি করে বসে রইলাম। শুধু একবার মাত্র ভগবানকে প্রাণ মন দিয়ে ডেকে নিলাম। আমাদের ডাকটা বোধ হয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার কানে গিয়ে পৌঁছেছিল, তাই সন্ন্যাসী আমাদের গাছের নীচ দিয়ে সোজাসুজি ভাবে চলে গেল।

ছেলেবেলায় শুনেছিলাম যে পাহাড় পর্ব্বতের গুহায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী থাকে, অনেক সন্ন্যাসী আবার তান্ত্রিক সাধক, অর্থাৎ তারা মানুষের মৃতদেহের ওপরে ব'সে মা কালীর সাধনা করে।

সন্ন্যাসীর চেহারা যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়, এ ব্যাটাও তান্ত্রিক সাধক। কপালে এক দীর্ঘ সিন্দূরের ফোঁটা, যেন তাজা রক্ত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালার পরিবর্ত্তে নরমুণ্ড ঝুল্‌ছে। দেহের গঠনখানি এমনি ভয়ানক যে —সেরূপ চেহারার লোক জীবনে সে-ই প্রথম চোখে পড়েছে। তার আগে আর কোনও দিন সে-রকম চেহারার লোক দেখিনি।

সেই রাতটা গাছের ওপরেই কাটিয়ে দিলুম।

ছয়

পরদিন চোখ মেলে চেয়ে দেখি, প্রতুল ও অমর আমার কাছে নেই। আমাদের শরীর গাছের ডালের সাথে এমনি করে বেঁধে রেখেছিলাম যে সহজে গাছ থেকে প'ড়ে যাবার ভয় ছিল না।

চোখ দুটোকে ভাল ক'রে রগড়ে নিয়ে চেয়ে দেখি, ভোরের সোনালী কিরণ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। এমন কি সেই সোনালী কিরণ আমার চোখের উপর প'ড়ে আমাকে জাগিয়ে তুলেছে। প্রতুল আর অমরের জন্য ভাবনা হয়ে গেল, তাই তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে চারদিকে চেয়ে দেখে নিলাম। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। মাত্র পাখীরা ভোরবেলায় গান গেয়ে পৃথিবীর লোক সুজাগ করে দিচ্ছে।

কিছু সময় সেই যায়গায় অপেক্ষা করাই উচিৎ মনে ক'রে গাছের গোড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, কারুর টিকির নাগালও পাওয়া গেল না। একা সেই যায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? কতক্ষণই বা তাদের জন্য অপেক্ষা করব।

হাত মুখ ধোয়ার বন্দোবস্তও তো করতে হবে। তাই নিকটেই কোন পুকুর আছে কিনা দেখ্‌তে গেলাম।

—কিন্তু কোথায়ও কিছু পেলাম না।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের তেজও প্রখর হ'তে লাগল। সূর্য্যের তাপে আর পথ চলা যায় না। ক্ষিধে তেষ্টায় ছাতি ফাট্‌বার উপক্রম হয়েছে। কাছাকাছি কোথাও কোন ফলের গাছও দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। একাকী কোথায় যাব? তিনজনে এক সঙ্গে থাক্‌লে হয়ত একটা কিছু উপায় ঠিক করা যেত। প্রতুল ও অমরকে খোঁজ না করে আমার নিজের প্রাণটার জন্যে উতলা হয়ে ওঠাও উচিত নয় মনে করে ক্ষুদ্র একটী পথ-রেখা ধরে হাটা সুরু করে দিলাম। কিছুদূর গিয়ে একটা যায়গায় থম্‌কে দাঁড়ালাম। কয়েক ফোটা রক্ত। রক্তের দাগগুলো যেন জীবন্ত মানুষের রক্ত। আমার সারা গা যেন একটা অজানিত আশঙ্কায় নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল।

কিছুদূর নজর দিতেই আবার তিন চা'র ফোটা রক্ত এমনি ক'রে দু'তিন হাত অন্তর অন্তর সেই রক্তের দাগ সোজা সুজি ভাবে পথ-রেখার মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

আমি আর এক-পাও এগোতে পারছিনা। কে যেন আমার পা দু'খানি জাপ্‌টে ধরেছে। যাক্,

এই রক্তের দাগ দেখে মিছি মিছি শোক করা প্রকৃত বীরের কর্ত্তব্য নয়। প্রায় আধ মাইল খানেক হেঁটে যাওয়ার পর আর কোনই দাগ দেখ্‌তে পেলাম না।—

তবে এই দাগ কিসের?

ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লাম, খানিকটা দূরে সেই দিকেই আগাছার ঝোপের মধ্যে দাগ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।

ডান দিক দিয়ে হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। কারণ সেদিকে দশ বার হাত পরেই একটী ছোট খাটো জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে কেমন করে ঢুক্‌ব? তবুও পিছ্‌ পা দেবার ছেলে আমি নই। কাজেই দু'হাত দিয়ে আগাছার ঝোপ ঠেলে একটু পথ করে নিয়ে মাত্র দশ বার হাত গিয়েছি, এমন সময় একটা অস্পষ্ট শব্দ আমার কানে এল। কে যেন চীৎকার কর্‌ছে, কিন্তু সে চীৎকার করতে পারছে না। হয়ত কেউ তার মুখ চেপে ধরেছে।

আগাছার ঝোপের মধ্য দিয়ে এ-দিক ও-দিক তাকানও কষ্ট, তাই একটা ছোট গাছের ওপর উঠে পড়লুম। খুব বড় বড় গাছ সেখানে ছিল না।

ছোট গাছটীর আগডালে উঠে যা দেখ্‌তে পেলাম তাতে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

একজন খুব লম্বা চওড়া চেহারার লোকের বুকের ওপর বেশ আরামছে বসে আছে একটী ম-স্ত ব-ড় বা-ঘ। বাঘ বেচারী বোধ হয় আর কারুর অপেক্ষায় আছে। সে এলেই ওর মাংস খাবে।

বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল সেই ভদ্রলোকের চেহারাখানা। আমাদের প্রতুল বা অমর তো নয়ই বরং এ ভদ্রলোককে বাঙ্গালী বলেই মনে হয় না। কারণ পড়নে তার হাফ্‌ প্যান্ট আর চেহারাখানা ঠিক যেন একজন মস্ত বড় শিকারীর মত। মনে মনে আমার বড্ড হাসি পাচ্ছিল। শিকারী হয়েও শিকারের পেটে। যাক্ খানিক-ক্ষণ চুপ করে গাছের উপরই থাক্‌তে হল। কারণ বাঘ বেচারী ওখান থেকে না গেলে যে আমার গাছ থেকে নাম্‌বারও উপায় নেই। বাঘও যাচ্ছে না আর আমিও গাছ থেকে নাম্‌ছি না—সেই গাছের ওপর বন্দী হ'য়ে-ই রইলাম।

সূর্য্যদেব ঠিক মাথার ওপর। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় স্থির থাক্‌তে পারছি না। সাম্‌নে বিপদ, পেছনে বিপদ, কোন দিকেই ভাল সামলান যাচ্ছে না। ভেবে ভেবে

আর কিছুই ঠিক করতে পার্‌ছি না। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আপনা থেকেই। যে দিকে তাকাই সেই দিকই যেন অন্ধকার। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগ্‌লাম। কেনই বা এলাম এই পাহাড়ে বেড়াতে? আর কেনই বা গাছের ওপর আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। বাড়ীতে ফিরে গেলেই হ'ত।

গুড়ুম্‌, গুড়ুম্‌ করে পর পর দুটো আওয়াজ হতেই চেয়ে দেখি,—বাঘটা চির বিদায় নিলে। আর কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাকিয়ে রইলাম। কেই বা গুলি ছুড়লে? আর তারা গেলই বা কোথায়? যে লোকটার বুকের ওপর বাঘ বসেছিল, সে লোকটা আর জীবিত নেই। তবে কা'র গুলিতে বাঘ ধরাশায়ী হল? এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে দেখছিলাম, কিন্তু কোনও দিকে একটাও জনপ্রাণীর সাড়া পেলাম না।

গাছের ওপর থেকে নীচে নামবার জোগাড় যন্ত্র করতে যাব এমন সময় আবার একটা শব্দ, এইবার স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারলাম যে এই মৃত বাঘটারই জ্ঞাতি ভাই নিকটেই আছে।

বাঘের ডাক জীবনে সেই প্রথম শুনেছি। এর আগে কল্‌কাতার চীড়িয়াখানায় বাঘ দেখেছি। কিন্তু

সেখানে ডাক দিতে শুনিনি কখনও।—আজ অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় সেই ভীষণ গোঙ্গানী শব্দে আমার পিলে ফাট্‌বার উপক্রম হয়ে উঠল? গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুড়ুম্ করে পর পর চার পাঁচটী আওয়াজ হল। আর সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বাঘের চীৎকার শব্দ।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চল্‌ছে। গুলি চালাচ্ছে একজন, আর একটী একটী করে ধরাশায়ী হচ্ছে অনেকগুলি বাঘ। যে লোকটী গুলি ছুড়ছে, সেই লোকটী একটী গাছের ওপর বেশ কায়দা করে বসে রয়েছে। তার হাতে দোনালা বন্দুক। আর সেই গাছের নীচে অসংখ্য বাঘ তাদের জাত ভাইদের মৃত্যুতে শোক করতে লেগে গেছে। অনেকক্ষণ ধ'রে গুলি চলবার পর হঠাৎ গুলি থেমে গেল।

এইবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিলাম যে লোকটী গুলি ছুড়ছে তার চেহারাখানা।

—কিন্তু একি?—

আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলাম। এতো আর কেউ নয়। আমাদের অমর। তবে প্রতুল গেল কোথায়?

আমি যে-গাছের ওপর থেকে যুদ্ধের দৃশ্য দেখ্‌ছিলাম, সেখান থেকে প্রায় দু'শো হাত তফাৎ ছিল অমরের

গাছটা। ভাল করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মাঝখানে একটী ছোট অথচ চওড়া জলাভূমি।

সেই জলাভূমির ওপরই বাঘগুলি ছুটাছুটী করছে।

গুলি আর চল্‌ছে না। অমর গাছের ওপর থেকে চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে। কেমন করে ওকে ইসারায় জানিয়ে দেব যে "আমি এখানেই আছি,"—এই ভাবনা-ই আমাকে পাগল করে তুলেছে।

আমি যে গাছটাতে আছি, সে গাছটী খুব ছোট। যদি বাঘগুলো টের পায় তা' হ'লে আর আমার রক্ষা নেই। ইচ্ছে করলে অতগুলো বাঘ গাছটা উপ্‌রে ফেলতে পারে।

পকেট থেকে একখানি রুমাল বা'র করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বাঘগুলির ওপর।

যে আশায় আমি রুমাল ফেলে দিলাম, এখন তার ফল হল বিপরীত। অমর যেন ভয় পেয়ে গেছে। তাই সে গাছের আগডালে উঠতে লাগ্‌লো। আর নিজেকে গা ঢাকা দিয়ে একখানি ডালের ওপর চুপ করে বসে রইল! আমি এখন আর তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

দেখা যাক্ কি হয়। চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। তাই আমিও হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লাম গাছের ডালের উপর।

ঘণ্টা খানেক পরে বাঘগুলো সেই যায়গা থেকে একে একে স'রে পড়ল।

আমি আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে সেই ভদ্রলোকের কাছে এসে হাজির হতেই অমর এসে আমাকে জড়িয়ে ধর্‌লে। একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে চল্‌ল। প্রথমতঃ অমরের হাতে একটী দোনালা বন্দুক। দ্বিতীয়তঃ প্রায় পাঁচ ছ'টী ছোট বড় বাঘ সেখানে প'ড়ে রয়েছে।

শিকারীর কোমরের বেল্ট-টা খুল্‌তে খুল্‌তে অমর বল্লে—

"ভাই, এতক্ষণ আমরা যে অবস্থায় ছিলেম, তাতে যে তোমার দেখা পাব, এ আশা আমাদের ছিল না। তবুও প্রতুলের খোঁজ নেই। এই ভদ্রলোকের জন্য-ই তোমাকে একলা ফে'লে আমরা এসেছিলাম। কিন্তু ওর প্রাণটা আর রক্ষা করতে পারলাম না। এখন এখানে এক মিনিটও অপেক্ষা করা উচিত নয়। যদি এখনই কোন বাঘ এসে পড়ে তবেই কর্ম্ম ফতে।" অমরের কথা শুনছিলাম, আর দেখছিলাম সেই ভদ্রলোকের চেহারাখানা, দেখ্‌লে একটা বীর পুরুষ ব'লে মনে হয়। এত বড় একজন শিকারী, তার এই দশা!

ভদ্রলোকের জামার পকেট তন্ন তন্ন করে দেখে কয়েকটী জিনিষ আমাদের লাভ হ'ল। একখানি নোট বই, কয়েকটী টাকা, একটী রিভলভার, আর টোটা ভরা বেল্ট। একখানি ছোট ছুরিও পাওয়া গেল। ভদ্রলোক বাঙ্গালী ত' নয়ই, বরং সুদূর পাশ্চাত্ত্য দেশের, ইংরেজ বা অন্য কোন দেশের হবে।

সেই জিনিষগুলি নিয়ে খুব দ্রুত সরে পড়লাম, একটু পরিষ্কার যায়গা দেখে সেখানে বিশ্রাম করে নেব, এই ভেবে একটা গাছের গোড়ায় একখানি বড় পাথরের উপরই বসে পড়লাম।

"ভাই, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আর যে হাট্‌তে পাচ্ছিনা! কিছু খাবার জোগাড় করে নিয়ে এস, আমি আর এক পাও এগোতে পাচ্ছিনা।"

অমর এই কথা কয়টী বলে আর কোন কথাই বল্‌তে পারছিল না। আমারও যে ঐ একই অবস্থা।

আমি আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করে ছুটে চল্‌লাম, কিছু ফল টল্ সংগ্রহ করবার জন্যে। বেশী দূর আর আমার যেতে হল না। নিকটেই একটা নারকেল গাছ ছিল, সেই নারকেল গাছ থেকে কয়েকটা নারকেল নিয়ে এলাম।

দু'জনেই নারকেল জল আর শ্বাস খেয়ে অনেকটা তাজা হ'লাম। কিন্তু প্রতুলের খোঁজ করি কেমন করে? সে যে কোন্ দিকে গিয়েছে, তারও তো কোনই ঠিক ঠিকানা নেই।

অমর সেই বন্দুকটা কাঁধে করে দক্ষিণ দিকে গেল, আর আমি রিভলভারটা হাতে করে উত্তর দিকে রওয়ানা হলাম। কথা রইল যে সন্ধ্যে হওয়ার পূর্ব্বে আবার দুজনে সেই গাছের গোড়ায় একত্র হব।

উত্তর দিকে মাইল খানেক হেঁটে চলেছি। পথে প্রতুলকে পাওয়া তো দূরের কথা, একটা জন প্রাণীর দেখাও পেলাম না।

বেলাও প্রায় শেষ হয়ে আস্‌ছে। পথে গাছ গাছড়াও বেশি নেই। তবে কেবল উঁচু নীচু পথ। কেবল পাথর। আর ছোট ছোট আগাছার গাছ। সেই আগাছার ঝোপ ঝাপের মধ্য দিয়েই পথ করে নিয়েছি।

এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে দেখ্‌ছি,—কোথাও প্রতুলকে দেখা যায় কিনা।

এমন সময় আমার নজরে পড়ল ডানাদিকে খানিকটা দূরে একটী ছোট নদী উত্তর দক্ষিণ দিকে বরাবর চলে

গিয়েছে। সে নদীটী চওড়ায় এত ছোট যে তাকে খাল বল্‌লেও চলে।

নদীর পাড়ে এসে দেখ্‌লাম—সেই নদীর স্রোতের বেগ এত যে তাকে রোধ করবার শক্তি বোধ হয় আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নি।

জল এত পরিষ্কার যে কল্‌কাতার কলের জলের চেয়েও সাদা ধপ্‌ধপে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতে ক'রে খানিকটা জল খেয়ে ফেল্‌লাম।

নদীর পাড়ে ব'সে পড়লাম। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহের ওপর দিয়ে সন্ধ্যাকালের ঝির্‌ঝিরে হাওয়া লেগে আমার চোখ দু'টোকে বুজিয়ে দিলে।

সাত

—এদিকে—

অমর হেটে চলেছিল বরাবর দক্ষিণদিকে।

দক্ষিণদিকে পাহাড়টা ক্রমশই উঁচু হ'য়ে গিয়েছে। —খানিকটা পথ সোজাসুজি ভাবে গিয়ে আবার একটা সিড়ি, সিড়ির ধাপগুণো উত্‌রে পার হ'তে পারলে আবার পাহাড়িয়া পথ, ছু' পাশে পাথরের ঢিবি, আর মাঝখান দিয়ে সুড়ঙ্গের মত পথ।

চারদিকে চোখ রেখে অমর চলেছে।

এই্ ভাবে আধমাইল খানেক পথ চলার পর একটা আচম্‌কা শব্দে সে চম্‌কে উঠ্‌ল।

যে যায়গা দিয়ে সে চলেছে, সেই ক্ষুদ্র পথরেখার ছু' পাশেই পাথরের ঢিবি। ওপর থেকে একটা পাথর এসে পড়্‌লো তার সাম্‌নে। পাথরটা ওজনে প্রায় ছু' তিন মণের কম হবে না। অল্প একটুর জন্যে তার গায়ে পড়েনি।

অমর ওপর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে কোথেকে এই পাথরটা পড়্‌ল—কোনও লোকে ফেলেনি ত'? পাহাড়ে তো অনেক অসভ্য লোক থাকে—যদিও সে কখনও তাদের চোখে দেখেনি।

মিনিট পাঁচেক সেই যায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাঁট্‌তে সুরু করে দিলে।

কিছুদূর গিয়েই আবার একটা সিঁড়ি, সেই সিঁড়ির ওপরে উঠ্‌তেই দেখ্‌লে খানিকটা পরিষ্কার যায়গা।

বেলাও প্রায় শেষ হ'য়ে এল। সন্ধ্যের আগে আবার ফির্‌তে হবে। যদি 'আমি' প্রতুলের খোঁজ পেয়ে থাকি তাই না ভেবে আবার পিছন দিকে ফির্‌বার মতলব আঁটছিলো, এমন সময় অকস্মাৎ চোখের সাম্‌নে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, যা সে জীবনে কখনও কল্পনায়ও আন্‌তে পারেনি।

—একটা ভীষণাকৃতির মোষ তার শিংএর মাথায় করে একটী বেটেপানা লোককে নিয়ে ছুটে আস্‌ছে।—ঠিক সোজাসুজি তারই দিকে।

এদিকে চার দিক থেকে অসংখ্য তীর এসে পড়্‌ল সেই মোষটার—গায়ে, মাথায়, পিঠে এমনকি লেজটীর মধ্যে পর্য্যন্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে সেই বেঁটে লোকটীর গায়ে একটী তীরও পড়ছে না।

কারা যে সেই তীর ছুড়ছে তা অমর দেখ্‌তে পেলে না। সে যে কি করবে কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারছে না। ওদিকে তার কাঁধে যে একটী বন্দুক রয়েছে সেদিকে মোটে ভ্রূক্ষেপই নেই। মোষটা তীর খেয়েও তার গোঁ থামাচ্ছে না।

যখন অমরের একেবারে কাছে এসে পড়েছে, তখন সে তার বন্দুকটার ঘোড়া টিপ্‌লে, আর অম্‌নি গু-ড়ু-ম, করে একটা আওয়াজ হ'ল।

এক গুলিতেই মোষ তার শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লে। কিন্তু তার শিংএর ওপরের বেঁটে লোকটীও মাটীতে পড়ে ছট্‌ ফট্‌ করতে লাগ্‌ল।

অমর দৌড়ে গিয়ে সেই বেঁটে লোকটীকে দেখ্‌তে যাবে, এমন সময় তার চারদিক থেকে প্রায় ৩।৪ শ' বেঁটে লোক একেবারে ঘিরে ফেল্লে। প্রত্যেকেরই হাতে তীর ধনুক। কেউ-ই লম্বায় দু' হাতের বেশী নয়। পড়নে একখানি লেংটী, গায়ে ও মুখে চুণ-কালী মাখান। এক অদ্ভুত বেশ। দেখ্‌লে মনে হয় যে এরা এক একজন বীর।

অমর ইচ্ছে করলে হয়ত এক গুলিতেই এর অর্দ্ধেককে সাবাড় করে দিতে পারত। কিন্তু সে যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মোষটার সঙ্গে সেই লোকটাও মারা গেল, এতে সেই অসভ্য বেটে লোকদের যত রাগ গিয়ে পড়ল অমরের ওপর।

—তাই অমরকে নিয়ে গেল তাদের আড্ডায়। অমরও বেশ শান্ত শিষ্ট ছেলেটীর মত নির্ব্বিবাদে তাদের সঙ্গে গেল।

আট

—আমার কথা—

আমি তো সেই নদীর ধারেই ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম, জানিনা। ঘুম থেকে জেগে চেয়ে দেখি যে আমি একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরের বারান্দায় শোয়া, আর সেই ঘরের বাইরে ব'সে দু'টা লোক তামাক খাচ্ছে।

লোক দু'টোর চেহারার দিকে তাকিয়ে বেশ দস্তুর মত ভয় পেয়েছিলাম।

আমার আবার ভয় কিসের? আমার হাতে এমন অস্ত্র রয়েছে, তাতে আবার ভয় পেতে হবে এই লোক দু'টোকে দেখে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম যে রিভলভারটা ঠিক আছে কিনা। রিভলভারটা ঠিক যেমনি ভাবে ছিল, তেমনিই রয়েছে।—তবে আর ভয় কিসের?

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। কিছুক্ষণের জন্যে চুপ চাপ বসে কেবল চোখ রগড়াতে লাগলুম, শুধু কেবল ওদের ভাবগতিক দেখ্‌বার জন্যে।

ওরা বেশ গল্প গুজবেই মেতে উঠেছে। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না। এইবার আমি দেখ্‌তে পেলাম যে আমি যে যায়গায় শুয়েছিলেম, সেই যায়গায় একটা মাতুর পড়ে রয়েছে। পাহাড়িয়া গাছের লতায় তৈরী মাতুরের ওপরেই আমি শুয়েছিলাম, তবে কি এরা আমার উপর দয়া দেখিয়েছে?

এখন আমার প্রধান চিন্তা হ'ল অমর ও প্রতুলের জন্যে। কিন্তু এদের ভাবগতিকটাও বোঝা দরকার। কি উপায়ে এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি? তাই খুব জোড়ে একটা কাশ দিলেম। যাতে করে ওরা টের পায় যে আমি সজাগ হয়েছি।

—হ'লও তাই—

ওরা দু'জনেই উঠে আমার কাছে এল, এবং হুকাটা আমার কাছে দিলে। ওরা হয়ত ভেবেছে যে আমি তামাক টামাক খাই। আমিও হুকায় তামাক খাওয়া সুরু করে দিলেম।

ওদের চেহারা ঠিক বাঙ্গালীর মতই। পড়নে লেংটীর বদলে কাপড়, তবে কাপড়খানা খুব ছোট, গায়ের রং একেবারে মিশ কালো।

তামাক খাচ্ছি আর বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌ছি। এমন সময় আমার নজরে পড়ল বাইরে টানান একখানি জালের দিকে।

—এইবার আর আমার বুঝতে বাকী রইল না যে এরা জেলে টেলে হবে হয়ত।

আমাকে কি যেন ব'লে ওরা চলে গেল। ওদের কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

কিছু সময় পরে ওরা নিয়ে এল নানা রকমের গাছের ফল। তার মধ্যে অনেকটারই নাম জানিনে, মাত্র আম ও কলা খেয়ে বাকীগুণো খাব ভাবছি এমন সময় একটী ছোট ল্যাংটা ছেলে এসে হাজির।

আমিও একটা সুযোগ পেলাম ফলগুলির সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে। তাই একটী তার হাতে 'তুলে দিতেই সেই ছেলেটীর মুখ দিয়ে হাসি বেড়িয়ে পড়ল। বেশ আনন্দের সহিতই নাচ্‌তে নাচ্‌তে সবগুলিই খেয়ে ফেল্‌ল। আমার ভাগ্যে ঐ কলা ও আম ছাড়া আর কিছুই জুট্‌ল না।

সব ফলগুলি ছেলেটাকে দিয়ে দিতে সেই লোকটী আরও

ফল নিয়ে এল। আমি কিন্তু তার একটীও খেলাম না। ইসারায় জানিয়ে দিলেম যে আমি ও-সব খাইনে।

আমায় বল্লে —"ব্যঠ্"

এই কথাটী আমি বুঝ্তে পারলাম। তাই আমিও ওদের জিজ্ঞেস করলেম—"এ কোন্ যায়গা হ্যায়।"

"পাহাড়-কা-ঘাটী"

"হাম্‌কে যাহাছে লে আয়া, ও কেত্না দূর হ্যায়"।

"যাস্তি দূর নেহী হ্যায়"

"হাম্‌কো হু'টো বন্ধু লোক হ্যায়, উন্ লোককে হাম্ হারায়া গিয়া, তুম্ লোক্ লে আনে দেনে ছেকেগা"

এইবার আমার কথা বেশ বুঝ্তে পেরেছে তাই আমায় শুধু বল্লে—"আল্‌বৎ ছেকেগা," হিয়া তোম্ ব্যঠ্, হাম্‌লোক লে আয়েগা।"

এই কথাকয়টী ব'লে আর একটু সময়ও অপেক্ষা করলে না। তারা দুজনেই চ'লে যাচ্ছে দেখে আমিও যেতে চাইলেম।

ওরা আমায় নিয়ে যেতে রাজী নয়।

অগত্যা অনুনয় বিনয় করা ছাড়া আর কোনই উপায় নেই, তাই কাকুতি মিনতি করে অনুরোধ জানালাম আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে।

আমার কোন কথাই তারা শুনলে না। সেদিনকার মত তারা চলে গেল তাদের কাজে, আমি পড়ে রইলাম সেই যায়গায় বন্দীর মত।

মনে মনে ভাবলাম অবশ্য যে আমি বন্দী হয়ে রয়েছি, আসলে কিন্তু ওরা আমায় বন্দী করেনি মোটেই।

ইচ্ছে করলে আমি সেখান থেকে একাও যেতে পারি, কিন্তু তা আমি যাব না। কারণ ওরা তো আমার কোন ক্ষতি করেনি। ওদের দ্বারা আমার অনেক কাজ হবে।

তখন বোধহয় বেলা দুপুর হবে। রোদের তেজটা একটু বেশী ব'লেই মনে হয়। সূর্য্যদেবের অধিষ্ঠানের যায়গাটা ঠিক নির্দ্দেশ করা যাচ্ছে না।

দুপুরে আমার আর কিছুই খাওয়া লাগবে না। তাই সেই কুঁড়ে ঘরখানির বারান্দায় সেই মাদুরটার ওপরই ঘুমাবার জোগাড় করে নিলাম। একদিকে রোদের তেজ, অপর দিকে প্রতুল ও অমরের জন্যে ভাবনা, আমায় যেন গোল পাকিয়ে দিয়েছে।

এই লোক দু'টীর সাহায্যে ওদের খোজ করে নেয়া ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম। জোর করে চোখ দু'টোকে বোজালাম, কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম আর আসে না।

—কার যেন পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখি যে সে-ই লোক দু'টী একটা বড় কাতলা মাছ হাতে করে দাড়িয়ে আছে—আর আমায় যেন কি বল্‌ছে।

আমিও অম্‌নি উঠে বস্‌লাম। এইবার আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে এরা আমায় রান্না করতে বল্‌ছে।

বাইরে উঠানে উনুন তৈরী করে, তাতে আগুন ধরিয়ে মাছ রান্না করবার যোগাড় করতে লাগলাম। এখন নুন মসলার দরকার। তাই বা পাই কোথা?

তেল নুনের কথা ভাব্‌ছি, এমন সময় দেখ্‌লাম যে সেই ছোট ছেলেটী নুন নিয়ে এল।

ওরা আমায় মাছটীকে আগুনে পোড়াতে বল্লে। শেষে কেমন করে খাব, তা আমায় দেখিয়ে দেবে।

আগুন ধরিয়ে দিয়ে মাছটাকে আস্ত পুড়িয়ে ফেল্‌লাম।

প্রায় আধঘণ্টাখানেক পরে ওরা নিয়ে এল কতকগুলি পাহাড়িয়া ভুট্টা।

সেই আস্ত ভুট্টার, ছড়া গুণোকেও পোড়ান হ'ল। পাহাড়িয়া লতার তৈরী একরকম ছোট ছোট ধামা নিয়ে এল, সেই ধামায় ভুট্টা গুণোকে ছড়ান হল, তারপর আমাদের খাওয়ার পালা। আস্ত মাছ বেশ

ভাল করে সিদ্ধ হলে, তার থেকে খানিকটা করে প্রত্যেককে দিয়ে আমি রাখলাম মাথার দিকটা।

সেই লোক দু'টীর একটীর নাম ছিল দুখন্, অপরটীর নাম ছিল ভুটিয়া, তারা দুজনেই মায়ের পেটের ভাই।

বড় ভাই দুখন্ বিয়ে করেছিল, কিন্তু সে বউ ঐ একটী ছেলে রেখে মারা যায়। তারপর আর বিয়ে করেনি, ছোট ভাই ভুটিয়া তো মোটে ক'রলেই না। ঐ একটী মাত্র ছেলেকে নিয়েই ওদের সংসার।

দুখন্ বল্‌লে—"বাবু, আপ্ আগারী খাইয়ে। হাম্‌লোক পিছারী খায়েগা।"

দুখনের কথা মত ভূট্টা চিবিয়ে মাছে নূন মাখিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেম। খেতে অবশ্য বেশ ভালই লেগেছিল, কিন্তু খেতে যতটা ভাল লেগেছিল, তার চেয়ে বেশী আনন্দ লেগেছিল ওদের আতিথেয়তা দেখে। দুখন্ আর ভুটিয়াকে নিয়েই সে দিনটা কেটে গেল। পরদিন ভোরের বেলা আমাকে নিয়ে ওরা যাবে প্রতুল আর অমরের খোঁজে এইরূপ স্থির হ'ল।

সন্ধ্যা হ'তে তখনও কিছু বাকী আছে। বাড়ীর উঠানে ব'সে আমরা তিন জনেই গল্প কর্‌ছি। ওদের বাড়ী ছিল পশ্চিম দেশে, কোন এক ঘটনা উপলক্ষে ওরা

দার্জ্জিলিংএ এসেছিল, তারপর যে কি ভাবে এই পাহাড়ে এসে আস্তানা গেরেছে তাই বল্‌লে।

এক কান দিয়ে ওদের কথা শুন্‌ছি, আর এক কান দিয়ে কথা বের হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একটা অসভ্য লোক এসে তুখন্‌কে নমস্কার কর্‌লে। লোকটীর পড়নে নেংটী ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু মাথায় একটা পাগড়ীর মত একটা কিছু জড়ান।

তুখন সেই অসভ্য লোকটার সাথে কথা বল্‌ছিল, তার কিছুই আমি বুঝ্‌তে পারলাম না। যাক্‌ আমি সেদিনকার মত চুপ্‌ চাপ্‌ রয়ে গেলাম, মোটের ওপর বল্‌তে কি, তুখন্‌ আর ভুটিয়াকে দিয়ে আমার উপকার ছাড়া অপকার হয় নি।

নয়

—অমরের উদ্ধার—

অমর'ত গেল সেই বেঁটে লোকগুণোর আড্ডায়। তাদের সঙ্গে যাওয়ার সময় দেখ্‌তে পেলে যে তারা যাঁচ্ছে পাহাড়েরই গুহার মধ্যে।

একটা খুব বড় রকমের গুহার মধ্যে তারা ঢুকে পড়ল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে অমরও গেল।

একটা ছোট খুপ্‌রীর মধ্যে তাকে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

এদিকে কোন্‌ ফাঁকে যে অমরের কাছ থেকে বন্দুকটা ওরা কেড়ে নিয়েছিল, তা অমর টেরও পায় নি।

যখন অসভ্যগুণো দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তখন অমরের খোঁজ পড়ল বন্দুকের।

যে যায়গাটায় অমর বন্দী হ'য়ে র'ইল তার তিনদিকেই পাথর, আর সাম্‌নের দিকে মাত্র একটী দরজা, সেই দরজা আবার এমনি মোটা কাঠ দিয়ে তৈরী যে তা ভাঙ্গা সহজ নয়।

অমর মহা ভাবনায় পড়ে গেল, এতক্ষণ যা হোক একটা সম্বল ছিল হাতের বন্ধুকটা। এখন সে সম্বলটুকুও নেই। কি উপায়ে এখন উদ্ধার হ'তে পারা যাবে?

কিন্তু উদ্ধার পাবার তো কোনই উপায় নেই। তাহলে বাস্তবিকই কি তাকে মর্‌তে হবে—এই বেটে লোক-গুণোর হাতে। মৃত্যুকে সে অনেকদিন আগেই বরণ করে নিয়েছিল।

অমরের মনে পড়্‌ল--তার সারা জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা। যে সকল ঘটনা মনে উঠ্‌লে এখন আর তার বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছে হয় না মোটেই।

সে তার সারা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছে ছন্ন ছাড়া ভাবে। কোনওরূপ সৎচিন্তা তার মনের কোণে স্থান পায়নি কখনও।

চিরকাল অসদুপায়ে টাকা পয়সা রোজগাড় করেছে। চুরী, ডাকাতি কোনটাই বাদ দেয় নি। কিন্তু তার শাস্তি সে পেয়েছে। আজ কি শেষ শাস্তি দেবে ভগবান! মনে মনে সে ভগবান্‌কে প্রণাম কর্‌লে।

"হে ভগবান্ আমার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি তুমি দিয়েছ। এতেও কি তোমার মনের সাধ পুরণ হয়নি।

আজ আমায় যে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছ, এর চেয়ে সেই সন্ন্যাসীর হাতে মরণও ভাল ছিল।"

অমর ভগবানকে ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল। তারপর তার চোখ দুটো এলো জড়িয়ে।

সেই যায়গায়ই ঘুমিয়ে পড়ল।

—এদিকে—

সেই অসভ্য লোকগুণো তাদের আড্ডায় বসে বেশ ধুমধামের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলে।

তখন রাত প্রায় আটটা হবে, সব লোকগুলিই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে, এমনকি সেই আনন্দের আতিশয্যে বেশ তালে তালে নাচা সুরু করে দিয়েছে।

সদর দরজার সামনে দু'দুটো বীর প্রহরীর মত দাড়িয়ে আছে। ভেতরে স্ফূর্ত্তির লহর চলেছে পুরোমাত্রায়।

প্রহরী দুটো অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থেকে আর থাকতে পারছে না দেখে সেই যায়গায়ই হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিল তা তারা জানে না, তবে যখন ঘুম থেকে জেগেছে, তখন ভেতরে চলেছে একটা

ভয়ানক যুদ্ধ। হুড়াহুড়ি, মারামারি, কাটাকাটি। মাঝে মাঝে গুড়ুম্, গুড়ুম্ শব্দ।

প্রহরী দু'টো তো ভয়েতে অস্থির। কি যে ক'রবে কিছুই ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারছে না। একবার ভেতরে আবার বাইরে, এইভাবে খানিকক্ষণ পায়চারী করবার পর আর থাক্‌তে পারলে না। সরাসর ভেতরে ঢুকে পড়ল।

তারা যখন ভেতরে প্রবেশ ক'রেছে, তখন সকলেই বাইরে বের হবার জন্যে ছুটে আস্‌ছে।

প্রহরী দু'টোও প্রাণের মায়ায় বাইরে বের হ'য়ে এল। ভেতরে যে কি হ'য়েছে কিছুই জান্‌তে পারলে না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় সব লোক বাইরে এসে পড়েছে। বাইরে এসে সকলে এক সঙ্গে জড় হ'য়ে একটা মতলব আঁটছিলো, যে কি উপায়ে এই সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পারা যায়। কিন্তু তাদের সে পরামর্শ করবার সময় না দিয়ে ভেতর থেকে একটা গুলি গিয়ে পড়ল, তাদের দলের মধ্যে—ঠিক দলপতির মাথায়। দলপতি পড়ে গেল, কিন্তু তাতে কি আর পিছ পা দেয়। এক একটা করে প্রায় দু'তিন শ' তীর ছুট্‌ল গুহার ভেতরে।

তীরগুলো গুহার ভেতরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে গুহার সদর দরজা গেল বন্ধ হয়ে।

বাইরে চল্‌ল বিরাট রকমের হাসির লহর। আর ভেতরে চল্‌ল গু-ড়ুম গু-ড়ুম শব্দ। পাথরে তো আর গুলি ভেদ করতে পার্‌ছে না। তাই ভেতরের বীর দু'টীর হ'ল বিষম সমস্যা।

"ভাই, একটা কাজ করা যাক্‌। পেছনে একটা দরজা আছে ব'লে মনে হয়। চল সে দিকটা একবার দেখে আসি। পরে যা হয় একটা মতলব করা যাবে।"

প্রতুলের কথা শুনে অমর বল্‌লে—"আচ্ছা? দেখা যাক্‌। চল—শীগ্‌গীর করে। সদর দরজা না খুল্‌তে পারলেও আমরা এখানে দম্‌ বন্ধ হয়ে ম'রে যাব।"

প্রতুল ও অমর উভয়ে সেখানে গিয়ে দেখে যে একটা দরজা আছে, কিন্তু সে দরজা খোলা বা ভাঙ্গা ভয়ানক শক্ত।

—অনেকক্ষণ ধ'রে দু'জনে চেষ্টা করলে খুল্‌বার। কিন্তু কিছুতেই খুল্‌তে পারলে না।

এদিকে এতক্ষণ গুহার মধ্যে যে আলো জ্বল্‌ছিল, তাও নিভে গেল। অন্ধকারের মধ্যে হাত্‌ড়াতে

হাত্‌ড়াতে তারা দু'জনে আবার সদর দরজার দিকে এগোতে লাগ্‌ল।

সদর দরজার ঠিক পাশে এসে চুপ্‌টী করে কান পেতে রইল যে বাইরে থেকে কিছু শোনা যায় কি না। দরজার ওপর দিকটায় খানিকটা যায়গা একটু ফাঁক করা। সেই ফাঁকা যায়গা দিয়ে একটু ক্ষীণ আলোক-রেখা ভেতরে এসে প্রবেশ করেছে। প্রতুল ভাব্‌লে সে যা হোক্ এখন হয়ত কোনও রকমে বেঁচে থাকা যাবে। বাইরে থেকেও বাতাস ভেতরে প্রবেশ কর্‌তে পারে, আবার ভেতর থেকেও বাইরে বের হ'তে পারে।

এই ভাবে কিছু সময় কেটে গেল, বাইরে যে কোনও রকমের জীবজন্তু আছে, এরূপ বোঝা গেল না। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, একটা শব্দ পর্য্যন্তও কানে আস্‌ছে না। প্রতুল ও অমর চুপ ক'রে ব'সে রইল।

রাত তখন প্রায় বারটা—হঠাৎ খটাং করে দরজাটা খুলে গেল। আহ্লাদে তখন প্রতুল এবং অমরের গায়ের জোর ডবল হয়ে গেল, এক লাফে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল।

—কিন্তু—

এ কী? বাইরে বের হ'য়ে আর এক পাও এগোতে পারছে না। দরজার ঠিক দু'পাশ দিয়ে দু'খানি হাত প্রতুল ও অমরের টুঁটি চেপে ধ'রেছে। আর একটু জোড়ে চেপে ধরলেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এমন সময় হ'ল একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড।

—সে কাণ্ডটা ভয়ানক রকমের আশ্চর্য্যের। অমরের হাতের বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল খানিকটা দূরে।

—অম্‌নি গু-ড়ু-ম্ করে একটা শব্দ হ'ল।—

শব্দটা বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আবার এক বিকট চীৎকার শব্দ।—সে শব্দ এমনই ভয়ানক যে কামানের শব্দও অত জোড়ে হয় না। একটা বিরাট দৈত্যের মত মানুষ নীচে প'ড়ে গেল। অমর ও প্রতুল উভয়েই ছাড়া পেলে। তারা দেখ্‌লে—একটা কালো কিম্ভূত কিমাকার পোষাক পড়া লোক যেন চির-নিদ্রার আশ্রয় নিয়েছে।

কেউ বন্দুক ছুড়্‌ল না, তবুও বন্দুকটার ভেতর থেকে গুলি বেরিয়ে এল। আবার আর একদিকে সেই এক গুলিতেই বিরাট দেহ ধরাশায়ী হ'ল। এটা একটা

আশ্চর্য্য ঘটনা। প্রতুল ও অমর যেন তাদের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে সেই বিরাট দৈত্যের সাম্‌নে গিয়ে ভাল ক'রে পরীক্ষা করে দেখে নিলে "লোকটা ম'রেছে তো?"

প্রতুলের কথার উত্তর না দিয়ে অমর তাকে টেনে নিয়ে চল্লো সেখান থেকে।

তখন রাতটাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্না-লোকে পাহাড়ের দৃশ্য এমনই সুন্দর যে অমর ও প্রতুল চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চল্‌ছিল, এমন কি 'আমার' কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো। তবুও তারা দু'বন্ধুই এসে ব'সে পড়ল একটা গাছের তলায়, যে গাছের নীচে আমার সাথে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। আমাকে না পেয়ে তারা হতাশ হ'য়ে পড়ল।

রাতের অন্ধকারে এমন অবস্থায় ব'সে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে উভয়েই গাছের ওপর উঠ্‌ল।

দশ

—এদিকে—

তুখন্ আর ভুটিয়ার কথামত পরদিন ভোরবেলা প্রতুল ও অমরের খোঁজে রওয়ানা হ'লাম।

আমরা তিনজনে একখানি নৌকায় উঠে বস্‌লাম। পাহাড়িয়া নদীর মধ্য দিয়ে নৌকাখানি চলেছে। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। নদীর দু' পাশে কত রকমের গাছ গাছড়া। তার অনেকগুলির নামও জানি না।

"তুখন্ হিয়াছে কেত্না দূর যানে হোগা ?"

"বহুত দূর হ্যায় দাদাবাবু।"

তুখনের কথা শুনে আমার ক্ষিধে লেগে গেল। অনেক দূরে যেতে হবে। বেলাও অনেক হয়ে গেছে।

অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি, একটা মানুষ তো দূরের কথা—একটা প্রাণীও দেখ্‌লাম না। শুধু কেবল গাছের ডালে ডালে দু'একটী পাখী ছুটাছুটি কর্‌ছে।

নদীটি ক্রমশই চওড়া হ'য়ে একটা বড় নদীতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। দু'ধারেই গাছ গাছড়ায় ভরপুর। সবগুলিই পাহাড়িয়া গাছ। খানিক দূরে গিয়েই ওরা আমাদের নৌকার গতিকে কমিয়ে দিলে। তারপর একটা জলাভূমির কাছাকাছি নঙ্গর করলে।

নৌকাখানাকে একটা গাছের গোড়ায় বেঁধে রেখে আমরা তিনজনেই চল্‌লাম পাহাড়ের ওপর।

তখন বেলা প্রায় বারটা হবে। ওপরে সূর্য্যের প্রখর তেজ, পায়ের তলায় পাথর, সাম্‌নে ও চারপাশে ছোট বড় অনেকগুলি পাহাড়ের চূড়া।

দূর থেকে মনে হয় যে এক একটী চূড়া যেন দিগন্ত প্রসারী আকাশের সঙ্গে মিশেছে।

এখন কোন্‌ দিকে যে যাব তা ঠিক করে উঠ্‌তে পারছি না। কারণ সে যায়গায় এর আগে কখনও গিয়েছি ব'লে মনে হয় না।

—তুখন্‌ ও ভুটিয়া আগে আগে চলেছে, আমি পেছন পেছন হাট্‌ছি।

একটা হোচট্‌ খেয়ে পড়ে গেলাম। তুখন্‌ ও ভুটিয়া আমাকে ধ'রে উঠালে। পায়ে এমন চোট লেগেছে যে আর হাট্‌তে পারছিনা। তুখন্‌ আমায় বস্‌তে বল্‌লে

একটা পাথরের ওপর। তাই আমি একটা বড় পাথরের উপর ব'সে পড়লাম। যে যায়গাটায় বসেছি, তারই ঠিক পেছনে একটা ছোট পাহাড়ের চূড়া—ঠিক দেওয়ালের মত আমাকে আড়াল ক'রে দিয়েছে।

এতে অবশ্য সূর্য্যের তেজটা একটু কম ব'লে বোধ হচ্ছিল। কিন্তু দিন দুপুরে যদি কোনও রকম জন্তু জানোয়াড়ের পাল্লায় পড়ি, তাই দুখন ও ভুটিয়া পাহাড়া দিচ্ছিল আমায়।

আমার পায়ের আঙ্গুলের মাথা কেটে গিয়ে রক্ত পড়্তে আরম্ভ ক'রেছে।

পকেট থেকে একখানা রুমাল বের ক'রে আঙ্গুল-গুলোকে জড়িয়ে বেঁধে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ আমার কানে গেল। আমি সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখি যে ভুটিয়া মাটীতে পড়ে ছট্ ফট্ কর্‌ছে—আর তার কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে একটা মস্ত বড় সাপ।

দুখন্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে পাহাড়ের চূড়ায়। আর আমি আমার নিজের পায়ের ক্ষতস্থানকে মেরামত করাকে রেখে দিয়ে ভুটিয়ার কাছে গেলাম।

ভুটিয়া ইসারায় দেখিয়ে দিলে তার পায়ের কোন্ যায়গাটায় সাপে কামড়িয়েছে।

এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না ক'রে আমি তার পায়ে একটা লতা জড়িয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল্‌লাম।

কিছু সময় পর্য্যন্ত আমি তার পা খানিকে ধরে রেখেছি, এদিকে তুখন্ আবার ছুটে এল ঊর্দ্ধশ্বাসে।

তুখনের হাতে কয়েকটা পাতা। আমাকে ইসারায় স'রে যেতে ব'লে সে লেগে গেল তার ভাইয়ের চিকিৎসায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কত রকমের মন্ত্র তন্ত্র আওড়ায়ে ও ফুঃ ফাঃ দিয়ে—তবে সাপ বেচারীকে নিয়ে এল সেই যায়গায়।

সাপ তো আস্‌তে চায় না। তুখন্‌ও তার প্রাণপণ শক্তিতে মন্ত্র আওড়াতে লাগ্‌ল।

যে যায়গায় সাপ কামড়িয়েছিল, সেই যায়গায়ই আবার মুখ দিলে, এইবার তার আগেকার বিষ চুষে নিলে। যখন সমস্তটুকু চুষে নিয়েছে তখন ভুটিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে বস্‌ল।

তুখনের অদ্ভুত চিকীৎসা দেখে আমি তো একেবারে থ' খেয়ে গেলাম। ছেলেবেলায় শুনেছিলেম যে পাহাড়িয়া লোকেরা সাপের মন্ত্র তন্ত্র জানে। এমন কি সাপে কামড়ালে সাত দিন পরেও তারা বাঁচাতে পারে।

এইবার চোখের সাম্‌নে সে জিনিষটাকে প্রত্যক্ষ করলাম।

মনে মনে তুখন্‌কে একটা নমস্কার করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে একটা ধন্যবাদ না দিয়ে আর পার্‌লাম না। যদি এই লোক দু'টাকে আমার সঙ্গে জুটিয়ে না দিতেন তা'হলে আর আমার বাড়ী ফিরে যেতে হ'ত না।

ভুটিয়া বেঁচে উঠ্‌ল, কিন্তু তার নড়বার চড়বার শক্তি রইল না মোটেই, তাকে একটু সুস্থ ক'রতে অনেক সময় লেগে গেল।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভুটিয়া একটু হাট্‌তে পেরেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ও তুখন্ কেউই সে যায়গা থেকে পা বাড়াইনি।

—যাক্ ভালয় ভালয় ভুটিয়া বেশ সুস্থ হয়েছে, তখন দিনের বেলাও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

আমরা তিনজনেই ধীরে ধীরে হাট্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। খানিক দূর পশ্চিমে গিয়েই একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠ্‌তে হবে। তাই আমরা তিনজনেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠ্‌তে আরম্ভ করে দিলেম, এমন সময়

আবার আর একটা ব্যাপার ঘট্‌ল যে ব্যাপারটা আরও বিস্ময়কর।

—হঠাৎ কোথা হ'তে উড়ে এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে একটা সাদা ধব্‌ধবে পাখী। সেই পাখীটার শরীরে বিদ্ধ একটা তীর।

—তীর খেয়ে পাখীটি উড়ে এসে পড়েছে।

আশ্রিতকে আশ্রয় দেওয়াই প্রকৃত বীরের লক্ষণ। তাই আমরা সেই পাখীটিকে খুব আদর যত্ন ক'রে নিয়ে চল্‌লাম ওপরের দিকে।

কে বা কা'রা এই পাখীটিকে তীর ছুঁড়েছে, হয়ত তারা সংখ্যায় একজন নয়, তাই ভয়ে বুকটা দূর্ দূর্ করে কেঁপে উঠ্‌ল।

চারদিক লক্ষ্য রেখে চলেছি, কোথায়ও কিছু নেই। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখ্‌তে পেলাম দুটো লোককে। তারা দু'জনে যেন্ কি নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছে।

ঝগড়ার বহরটা যখন একেবারে সপ্তমে গিয়ে চড়েছে, তখন আমরা গিয়ে হাজির তাদের একেবারে সাম্‌নে।

দুখন্ ও ভুটিয়া তাদের সাথে কথা বল্‌লে, আমি চুপ্‌টী করে দাড়িয়েই রইলাম। আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বের হ'ল না।

ওদের ঝগড়া থেমে গেল, কিন্তু এর একটা কিছু মীমাংসার ভার পড়ল গিয়ে ডুখনের ওপর।

—ডুখন্ পড়ল মহা মুস্কিলে।

লোকত্ব'টীর মধ্যে কে সেই সাদা পাখীকে মেরেছে। অর্থাৎ কার বাণ বিদ্ধ হয়েছে।

আমি যদিও ততক্ষণে পাখীর গা থেকে তীরটা উঠিয়ে নিয়েছি। ডুখন্ পেলে সেই তীরটা।

তীরে তো আর নাম লেখা নেই। আর লেখা থাক্‌লেও তো ওদের পড়বার সাধ্যি ছিল না। ওরা পাহাড়িয়া জাত, ওরা লেখাপড়ার ধার ধারে না।

ডুখন্ একবার আমার দিকে আবার ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কি যে ক'রবে কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারছে না।

তখন তারা নিজেরাই ডুখন্‌কে বল্‌লে যে সেই পাহাড়ের গায়ে একটা ক'রে তীর ছুড়তে হবে, যার তীর লক্ষ্য ভেদ করবে সে-ই পাখীটা পাবে।

ডুখন্ এতে রাজী হল, আমার কিন্তু মনটা কেমন খাপছাড়া ঠেক্‌ছিল। আমি তখন বল্‌লাম যে "এ পাখী তোমরা কেউই পাবে না। এ পাখী আমার, তোমরা যদি

এই পাখী নিতে চাও তো আমার সাথে একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে।

ওরা তখন আমার কথা শুনে উৎসুকভাবে আমার দিকেই তাকিয়ে রইল।

ওরা আমার কথা বুঝ্তে পারবে না ভেবে তুখন্‌কে বুঝিয়ে বল্‌লাম আমার মতলবটা।

তুখন্ ওদের ব'লে দিলে আমার প্রতিজ্ঞার কথা।

ওরা রাজী হ'ল, এবং তখনই আমাদের এগিয়ে নিয়ে চল্‌ল। ওরা উভয়েই ব'লে দিলে যে প্রতুল ও অমরকে তারা দেখেছে, নিকটেই একটা গাছের ওপর।

প্রতুল ও অমরের সন্ধান যে আমাকে আগে দিতে পার্‌বে সেই ঐ সাদা পাখীটাকে পাবে।

ওরা চলেছে যেন একটা স্ফূর্ত্তির ঢেউ ছড়িয়ে। কোনও রকমের জীবজন্তুর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি।

এমনি ভাবে আমরা পাঁচজনে চলেছি যেন একটা বি-রা-ট অভিযানে, আসলে কিন্তু আমাদের অভিযান শুধু আমার বন্ধুদের খোঁজ করা।

মস্ত বড় পাহাড়। সেই পাহাড়ের আনাচে কানাচে খোঁজ করে দেখতে গেলে যে আমাদের কতদিন সময় লাগ্‌বে তারও তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

সন্ধে হ'য়ে এসেছে, দিনের বেলায় যাহোক আমরা বেশ নিরাপদেই পথ হেটে এসেছি। এখন রাতের অন্ধকারে হেটে যাওয়াও তো মুস্কিল হ'য়ে দাড়াবে।

তুখন্ বল্‌লে যে একটা যায়গায় আস্তানা খুঁজে নেয়া যাক্। আমাদের দলে কোনওরূপ সাজ সরঞ্জাম নেই, যাতে আমরা একটা যায়গায় আস্তানাগেরে থাক্‌তে পারি। —হয় একটা গাছের ওপর আশ্রয় নিতে হবে, না হয় কোন গুহার মধ্যে রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু যদি কোন গুহার মধ্যে আশ্রয় লই তাহলে হয়ত সাপে কামড়ে দেবে।

আর সাপে কামড়ালেই বা—আমাদের সাথে তো সাপের ওঝাই আছে।

এতে কোনও রকম ভয় থাকা আদৌ উচিত নয়, তাই একটা গুহার মধ্যে বিশ্রাম করব ব'লে ঠিক ক'রে ফেল্‌লাম।

তুখন্ ও ভুটিয়া সেই গুহার ঠিক দরজায় ব'সে পড়ল, আমি গেলাম ভেতরে। সেই পাহাড়িয়া লোক তু'টীও ভেতরে রইল।

খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক ছিল। কাজেই সে বিষয়ে আর ভাব্‌তে হ'ল না।

কয়েক ছড়া ভূট্টা নিয়ে এসেছিল দুখন্, যাতে ক'রে ভুটিয়া অনেকটা সুস্থ হ'য়েছিল।

সেই ভুট্টাগুলোকে পুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেম। খেতে খেতে ওরা ব'সে ব'সে গল্প করছে আর আমি ভাব্ছি। যত সব ছাই ভস্ম নানা রকম দুশ্চিন্তা আমার সারা মনকে অধিকার ক'রে বসেছে। যদি প্রতুলকে না পাওয়া যায়, তবে আমি কেমন ক'রে বাড়ী ফিরব। অমরের কথা—সে মরুক্‌গে, তাতে আমার কিছুই আপশোষ নেই। ও তো আমাদের দু'দিনের সাথী, আর প্রতুল—তার সম্বন্ধে কোনওরূপ কুভাবনা মনে হ'লে আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে।

এমনি ভাবে কখন প্রতুল, কখন অমরের জন্যে ভাব্না চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি। সেখানে নেই আলো, নেই বিছানা পত্র, তবুও আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

যদি কোনওরকমের বিপদে পড়ি, তা'হলে আত্মরক্ষা করবার মত অস্ত্র শস্ত্র আমাদের যথেষ্ট আছে, প্রথমতঃ দুখন্ ও ভুটিয়ার হাতে বর্ষা, ও লাঠী, আর পাহাড়িয়া লোক দু'টীর তীর ধনুক। আমার কাছেও একটী রিভলভার আছে।

কিন্তু এত সব অস্ত্র শস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম সকলকে উপেক্ষা করে স্বয়ং ভগবানই বোধ হয় লাফিয়ে পড়েছেন আমাদের ওপর।

নিরীহ প্রাণী ও দরিদ্র জাতির উপর অত্যাচার করতে ওস্তাদ তো আর কেউই নেই। ভগবান তার বীরত্বের পরিচয় দেন ঐ নিরীহ প্রাণী ও দরিদ্র জাতিদের উপর অন্যায় আচরণ করে।

—হঠাৎ একটা চীৎকার শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লুম গুহারই মধ্যে। তখন বাইরে চলেছিল ভয়ানক রকমের যুদ্ধ।

একটা মস্ত বড় বলবান সিংহ লাফিয়ে পড়েছে তুখনের ঘাড়ে, আর ভুটিয়া তার প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করছে ওকে ছাড়াতে। বর্ষার ফলক সিংহের পেটে বিদ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু তাতেও সিংহের বিক্রম কম্‌ছে না। তুখন্ তার প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করছে সিংহের কবলথেকে আত্মরক্ষা করবার। সিংহের চেয়ে সেও কম নয়।

অন্ধকারের মধ্য হ'তে তাকিয়ে দেখ্‌ছি কিন্তু আমার যে কি করা উচিত তাই ভেবে ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। এদিকে আমার পাশের লোক তু'টীও ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। তাদের জাগিয়ে তুল্‌লাম।

তারা দু'জনেই উঠে পড়ল, কিন্তু সাম্‌নের দিকে এগোনো তো দূরের কথা, একটু একটু ক'রে পেছন দিকে স'রে যাচ্ছিল। আমি আর ঠিক থাকতে পারলুম না। পকেট থেকে রিভলভার তুলে নিয়ে ছুড়লাম ঠিক সিংহের মাথা লক্ষ্য ক'রে।

পর পর তিন চারটী গুলি ছুড়লাম, কিন্তু তাতেও তার তেজ কম্‌ছে না। কারণ এক একটা গুলি ছুড়বার সঙ্গে সঙ্গে সিংহও নড়চড় করে আমার লক্ষ্যকে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে।

এক একটা হুঙ্কার শব্দে সমস্ত পাহাড়কে কাঁপিয়ে তুলেছে। আমি যখন পঞ্চম গুলি ছুড়ব, এমন সময় সিংহের চোখে গিয়ে পড়ল দু-দু'টো তীর।

তীরের ফলকে বিষ মাখান ছিল। সেই বিষের জ্বালা, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের যন্ত্রণা—দু'টোর সমন্বয়ে সিংহ নীচে লুটিয়ে পড়ল।

সেই অবসরে ভুটিয়া আবার বর্ষার ফলক দিয়ে সিংহের দফাকে রফা ক'রে তবে ছাড়লে।

সিংহ তার শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বার আগে একটা আর্ত্তনাদ ক'রে নিলে।

আমরা সকলেই সিংহের কাছে ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌ছিলাম যে তখন পর্য্যন্তও প্রাণ আছে কিনা, এমন সময়

সেই গুহার মধ্য হ'তে দু'টী ছোট ছোট বাচ্চা বেরিয়ে এল। বাচ্চা দু'টী কুৎ-কুৎ করতে করতে সিংহের মৃতদেহের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। বাচ্চা দু'টীর কান্না দেখে কার না দয়া হয়। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা হ'ল বাচ্চা দু'টীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমাদের সঙ্গের সেই পাহাড়িয়া লোক দু'টী নিষেধ করলে। তারা যে কেন নিষেধ করেছে তার কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তখনকার মত সেই যায়গায় রয়ে গেলাম, আর কোথাও গেলাম না।

সে রাত্রে আর কোনওরূপ বিপদ আপদ হয়নি।

এগার

একদিকে আমরা যেমন পাঁচটী প্রাণী সেই গুহায় রাত কাটিয়ে দিয়েছি। আবার আর একদিকে প্রতুল ও অমর গাছের ওপরেই বেশ নিরাপদে কাটিয়ে দিলে ॥

পরদিন ভোর বেলায় ঘুম থেকে জেগে অমর বল্লে— "ভাই এখন কেমন বোধ করছ। কালকের অবস্থাটা মনে পড়ে তো।"

হ্যাঁ! বেশ ভাল রকমই, ও রকম অবস্থার কথা জীবনে কখনও ভুলবার নয়। লোকগুলোকে বেটে দেখ্তে সত্য, কিন্তু ওদের গায়ে যেমন শক্তি তেমনি ওদের একতা। দলপতির একটা হুঙ্কারে দলের সব লোক এসে জড়ো হয় একই সঙ্গে।

আমাকে যখন ওরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো তখন আমি আর কোন কথাই বল্‌তে পারছিলাম না।"

প্রতুলের কথা শুনে অমর বল্‌লে—

"এখন বিনয়ের যে কি অবস্থা হ'ল তার তো কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না। আমাকে রক্ষা করেছ তোমরা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের জন্যে আমার লড়তে হ'বে। এতে প্রাণ যায় তা-ও স্বীকার।"

প্রতুল ও অমরের প্রধান চিন্তা হ'ল 'আমার' জন্যে, আমাকে ফেলে রেখেও যেতে পার্‌ছে না।

"এখন কি করা যায়?"

"চল, যাই উত্তর দিকে খানিকটা দূর হেটে গিয়ে দেখে আসি। আমার মন বল্‌ছে যে ও প্রাণে বেঁচে আছে এখনও।"

প্রতুলের কথা শুনে অমর আর কোনই উত্তর করলে না। সে মনে মনে কি যে ভাব্‌ছিল, তা সে নিজেই জানে না, তারপর প্রতুলকে বল্‌লে—"আচ্ছা ভাই, চল। খানিকটা দূর হেটে দেখে নেওয়া যাক্‌। কোথায়ও বিনয়কে পাওয়া যায় কিনা।"

প্রতুল ও অমর উভয়েই গাছ থেকে নেমে ঠিক সোজা সুজি উত্তর দিকে রওয়ানা হ'ল।

খানিকটা দূর হেটে গিয়েই দেখ্‌তে পেলে—একটা হরিণ চ'ড়ে বেড়াচ্ছে।

হরিণটী দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। প্রতুলের বড়ই সাধ হ'ল সেই হরিণের বাচ্চাকে ধ'রে নিয়ে যাবার। তাই অমরকে বল্লে তার মনের সাধটা।

"হরিণের বাচ্চাকে ধরা তত সোজা নয়।"

অমরের কথা শুনে প্রতুলের হ'ল জেদ, ঐ হরিণের বাচ্চাকে ধরবার জন্যে। তাই লেগে গেল ঐ একরত্তি হরিণটাকে ধ'রতে।

যেই ধরতে যায় অমনি সে-ও ছুটে পালিয়ে যায়। এমনি ক'রে দু' বন্ধুতে দু'দিক দিয়ে ঘিরে ধরবার চেষ্টা কর্‌ছিল। যখন একেবারে লাগামের ভেতরে এসে পড়েছে, তখন সেই হরিণটী এমন ছুট্ দিলে যে তাকে তখন ধ'রে কার সাধ্য।

দৌড়ে ও লাফে হরিণের সাথে কোন জন্তু জানোয়ারই পেরে ওঠে না।

হরিণশিশু এত জোরে ছুট্‌ছিল যে তাকে ধরতে আর পারা গেল না ভেবে অমর আশা একেবারেই ছেড়ে দিলে।

"যাঃ—আর ধরা গেল না।"

প্রতুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে।

অমরের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু মুচ্‌কী হাসি বেরিয়ে পড়ল।

অমর হাস্‌ছে—আর প্রতুলের প্রাণটা আই ঢাই কর্‌ছে হরিণের বাচ্চার জন্যে।

অমরকে হাস্‌তে দেখে প্রতুলের বড্ড রাগ হচ্ছিল, কিন্তু রাগ করবেই বা কা'র জন্যে।

যদি সে ধ'রতেই পারত, তবে দেখিয়ে দিত যে কত ধানে কত চাল হয়। কাজেই হাল ছেড়ে দিতে হ'ল।

—হঠাৎ দু'জনেই থম্‌কে দাড়াল।

হরিণটী তাদের দিকেই ছুটে আস্‌ছে।

"অমর! হরিণটা আমাদের দিকেই ছুটে আস্‌ছে কেন?"

"প্রতুল! আমার পেছন দিকে ঠিক হ'য়ে দাড়া, ঐ যে একটা বাঘ দৌড়ে আস্‌ছে। আমি এর মধ্যে বন্দুকটাকে ঠিক ক'রে নেই।"

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই হরিণশিশু প্রতুল ও অমরের একেবারে কাছে এসেই চুপ্‌টী করে দাড়িয়ে রইল। অমর তার হাতের বন্দুকটীকে ঠিক বাগ মত ধর্‌বার আগেই বাঘ এসে পড়েছে।



......হরিণটা প্রতুলের ঠিক পাশেই চুপ্‌টী করে বসে আছে। পৃঃ ৮৭

প্রতুল একটা চীৎকার ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

অমর তার হাতের বন্দুকে গুলি পুরবার আগেই বাঘ লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর—

—প্রতুল তো অজ্ঞান হ'য়েই পড়ে রইল।

অমর আর কি করে—হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে ব'সে না থেকে বাঘের সাথে লড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বন্দুকের সঙ্গীন দিয়ে যতটা পারলে আঘাত করতে করতে বাঘটাকে কতকটা ঘায়েল ক'রেছে। কিন্তু বাঘ তো ছেড়ে দেবার পাত্র নয়—তাই সে-ও তার প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা কর্‌ছে।

—কে-উই কম নয়।

অমরও যেমন তেমন লোক নয়, যে সহজেই প্রাণটাকে ছেড়ে দেবে।

এদিকে সেই হরিণটা তো প্রতুলের ঠিক পাশেই চুপটী করে ব'সে আছে। ব'সে আছে সত্য কিন্তু তার সারা গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে। কখন বাঘটা যে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে—তারই অপেক্ষায়।

প্রতুল চোখ মেলে চেয়ে যা দেখ্‌লে তাতে তার প্রাণে বেঁচে থাক্‌বার আশাকে একদম ছেড়ে দিতে হ'ল।

অমরের সাথে যুদ্ধ ক'রে বাঘ বেচারি তো অনেকটা কাবু হয়ে পড়েছে, তাই তাকে ছেড়ে দিয়ে সেও একটু জিড়িয়ে নিচ্ছে ও হাঁপাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

অমরের সারা গা দিয়ে দর দর ধারে রক্ত পড়তে লাগ্ল।

তবুও সে রুখে দাঁড়াল।

. এদিকে হরিণটী তার শিংএর খোঁচা দিয়ে প্রতুলকে সজাগ ক'রে দিয়েছে।

প্রতুলের তো হাত পা যেন ভয়েতে অসাড় হ'য়ে গেছে। তবুও মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শেষ চেষ্টা সে দেখে নেবে।

—হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি বেরিয়ে এল।

তাই সেই মুহূর্ত্তেই তার পকেট থেকে দেশলাই বের করে সেই যায়গায় শুক্‌নো লতা পাতায় আগুণ ধরিয়ে দিলে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলে উঠ্‌ল।

অমর আনন্দে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে গেছে। তাই এক লাফে সেই আগুণের কুণ্ডের পেছনে এসে পড়ল।

বাঘ বেচারী তো সেই একই যায়গায় পড়ে থেকে হাঁপাচ্ছে।

বাঘ যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, আগুণের কুণ্ডের সাম্‌নে তার জারিজুরি সব লোপ পেয়ে যায়। এক একটা গর্জ্জন শব্দে প্রতুলদের চমক্ লাগিয়ে দেয়, আবার পিছু হ'টে যায়। গায়ের জোরও ক্রমেই কমে আস্‌ছে। আগুণের শিখা যেন সকলকেই গিলে ফেল্‌তে চায়।

হরিণশিশু ঠায় চাপ্‌টী লেগেই দাঁড়িয়ে আছে, আর ঠক্ ঠক্ কাঁপছে।

প্রতুল তো ছুটাছুটী ক'রে শুক্‌নো পাতা একত্র ক'রে এনে জড়ো করেছে সেই আগুণের কুণ্ডের মধ্যে।

—এমনি ভাবে খানিকক্ষণ কেটে গেল।

অমরের সমস্ত শক্তিও লুপ্ত-প্রায়। বন্দুকের ঘোড়া টিপ্‌বার শক্তিও যে তার নেই।

বন্দুকটী একটু দূরে প'ড়েছিল। প্রতুল হামাগুড়ি দিয়ে সেটী কুড়িয়ে নিলে।

এতক্ষণে বাঘ যেন নেতিয়ে পড়েছে। সেও সেই যায়গায়ই শুয়ে পড়ল।

আগুণের তেজটা যখন ক্রমে ক্রমে কমে আস্‌ছে, তখন প্রতুল তার প্রাণপণ শক্তিতে বন্দুক ছুঁড়লে। গু-ড়ুম্ গু-ড়ুম্ ক'রে পর পর তিনচা'রটী আওয়াজ

হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গর্জ্জন। কিছুতেই বাঘ শেষ হচ্ছে না দেখে অমর হাতে নিলে বন্দুক।

অমরের গুলিতে বাঘ চির বিদায় নিলে।

—কিন্তু—

অমরেও অবস্থা তখন একেবারে শোচনীয়। তার হাত থেকে বন্দুকটা প'ড়ে গেল। সেও আর দাড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না। সেই যায়গায়ই পড়ে গেল।

"বন্ধু! এ-ক ফো-টা জ-ল।"

প্রতুল আর কি করে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল জল আন্‌তে।

কিন্তু জল পাবে কোথায়?

ঘণ্টাখানেক ছুটাছুটী ক'রে একটা ঝরণা দেখ্‌তে পেলে। এখন জল নিয়ে যাবে কিসে ক'রে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমালখানা বের ক'রে সেই-টা ভিজিয়ে নিয়ে এল অমরের কাছে।

জল নিয়ে এসে যেই অমরের মুখে দিতে যাবে তখনি তার হাত থেকে রুমালখানি পড়ে গেল।

"এ কী?"

অমরের চোখের পাতা নড়্‌ছেও না, আর কথাও বল্‌তে পার্‌ছে না। সমস্ত শরীর যেন নিথর নিস্পন্দ।

প্রতুলের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ঠিক অমরেরই গায়।

—জল গড়িয়ে পড়লে কি হবে?

অমরের আত্মা তখন ওপর থেকে দেখ্‌ছে, কিন্তু অমরের দেহ তো দেখ্‌তে পেলে না। প্রতুল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে কান্না সুরু ক'রে দিয়েছে।

—"হায় বন্ধু! তোমাকে পেয়েছিলাম এই পাহাড়ে একান্ত নিঃস্বহায় ভাবে, আর আজ রেখে গেলাম তোমাকে এই পাহাড়েরই চূড়ায়। তোমার মৃত আত্মার কাছে ক্ষমা ভীক্ষা চাইছি, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের কাছে, প্রার্থনা কর্‌ছি যে তোমার মৃত আত্মার যেন সদ্গতি হয়। মৃত্যুর পরপারে যেন তোমার সাথে আবার মিলিত হ'তে পারি।"

প্রতুল চেয়ে দেখ্‌লে হরিণটার দিকে। তখন হরিণ শিশুরও চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে।

একটা সামান্য পশু, তারও আবার মায়া। এ সবই তো ভগবানের লীলা।

প্রতুলের কিন্তু যত রাগ গিয়ে পড়ল এই হরিণ শিশুরই ওপর। ওর জন্যেই তো অমর গেল ধরাধাম হ'তে চ'লে। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষকে অবহেলা

করতে নেই, তাই প্রতুল তার দুঃখের বহরটাকে একটু কমিয়ে নিলে হরিণটিকে কোলে ক'রে।

এখন কি করা যায়। প্রতুল তো একা, অমরের দেহের সদ্গতি করাও দরকার।

সে একাই বন্দুকের সঙ্গীনের সাহায্যে খানিকটা মাটী খুড়ে নিয়ে অমরকে শেষ শয্যা রচনা ক'রে দিলে।

বেলা প্রায় বারটা হ'বে, তখন অমরের সৎকার শেষ হ'য়ে এসেছে।

প্রতুলের সাথী ঐ একরত্তি হরিণ-শিশু।

যে যায়গায় অমরকে পোড়ান হ'ল সেই জায়গায় একটা গাছের ডাল পুতে রেখে প্রতুল বেরিয়ে পড়ল 'আমারই' খোঁজে।

হরিণটীকে কোলে ক'রে আস্তে আস্তে পথ চলে সেই নদীর পাড়ে এসে ব'সে পড়ল, যে নদীর পাড়েই আমি বসেছিলেম।

বার

—এদিকে—

আমরা পাঁচ জনে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলেম সেই গুহার মধ্যে।

পরদিন ভোর বেলায় সেখান থেকে রওয়ানা হলেম সোজাসুজি ঠিক পশ্চিমদিকে।

সিংহের বাচ্চা দু'টিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম, সেই পাখীটাও এখন বেশ তাজা হয়ে উঠেছে, এমনকি বেশ পোষ মেনেছে। কোথায়ও উড়ে যাওয়ার চেষ্টাও ক'রছে না।

পাহাড়িয়া লোক দু'টিও তাদের সেই পাখীর কথা একেবারে ভুলেই গেছে। তারা দু'জনে এখন যেন এক-মন এক-প্রাণ।

আগেকার সেই ঝগড়া ঝাটি ভুলে গিয়ে তারা লেগে গেছে আমার বন্ধুদের খোঁজ করবার জন্যে।

পাহাড়ের প্রত্যেকটি পথ তন্ন তন্ন করে তারা দেখে নিচ্ছে।

আমি দুখনকে বল্‌লাম আমাদের সেই চিহ্নিত গাছটার কথা—সেখানে যেতে পারলে হয়ত একটা কিছু নিশানা পাওয়া যেত।

দুখন্ আমায় জানিয়ে দিলে যে আর বেশী দূর যেতে হবেনা, শীগ্‌গীরই ওদের পেয়ে যাব। মনটাকে অনেকটা সান্ত্বনা দিলেম।

বেশ সন্তর্পনে পথ চলেছি। আর চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছি।

পাহাড়ের এমন যায়গায় আমরা এসে পড়েছি যে তারই কাছে একটা দিক ক্রমশই উঁচু হয়ে উঠেছে, যেন একটি চূড়া।

দুখন্‌কে বল্‌লাম—সেই চূড়ায় উঠে দেখ্‌তে। আমরা পাঁচ জনে একত্র হ'য়েই সেই চূড়ায় উঠে

দেখ্ছিলাম যে নিকটে কোন লোকালয় আছে কি না।

যদি পাহাড়িয়া লোকের আড্ডাও একটা আধটা থাকে তা'হলে আমরা সেখানে একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে পারব।

—হঠাৎ ডুখন্ আমাকে এক ধাক্কা দিলে। সেই ধাক্কার চোটে আমি হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলাম। উঠ্তেই আমায় দেখিয়ে দিলে—অনেক দূরে ধূ ধূ কর্ছে একটা আগুণের কুণ্ড।

আগুণের কুণ্ড ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না, তবে তার ধোঁয়া যে আকাশের সাথে মিশে যাচ্ছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

যে যায়গা হ'তে সেই ধোঁয়া উঠ্ছে, সে যায়গায় কোন লোক আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। মাত্র ধূ ধূ করছে ধোঁয়া আর আগুণের শিখা।

আমার মনে হ'ল যে সেখানথেকে প্রায় এক মাইলের পথ হবে।

ডুখন্‌কে বল্‌লাম ঐ ধোঁয়াকে লক্ষ্য ক'রে পথ চল্‌তে। পাহাড়িয়ার গাছ গাছড়ার মধ্য দিয়ে সোজাসুজি পথ ক'রে নিলাম।

আমরা পাঁচ জনেই দ্রুত হেটে চলেছি। আগাছার ঝোপ ঝাপকে ঠেলে পথ করে নিচ্ছি, এতে আমাদের অনেকটা সময় কেটে গেল।

তখন সূর্য্যদেব ঠিক মাথার ওপর।

বেলা বোধহয় বারটা বেজে গেছে। আমাদের সকলেরই ক্ষিধে লেগে গেছে। সাম্‌নেই একটা নারকেল গাছ ছিল। আমার সঙ্গের পাহাড়িয়া লোক দু'টীই সেই গাছ থেকে অনেকগুলি নারকেল পেড়ে নিয়ে এল।

বেশ আরাম ক'রে নারকেলের জল ও শ্বাস খেয়ে খানিকটা ক্ষুধার নিবৃত্তি করলাম।

পেট্‌টা ঠাণ্ডা হ'ল বটে কিন্তু মনের ক্ষুধার যে আর নিবৃত্তি হচ্ছেনা। প্রতুল ও অমরকে তো খুঁজে বের করতেই হ'বে, তাদের না পেলে বাড়ীতেই বা ফিরে যাব কেমন ক'রে? আমার মনকে আর কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না। কোথায় পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে বেশ একটা আমোদ পাব-তাতে সেখানে আমোদের বদলে পেলাম্ কতরকমের শিক্ষা, যা' জীবনের প্রত্যেক কাজের খুটী' নাটীর ভেতরে জেগে উঠ্‌বে একটা জীবন্ত মূর্ত্তি হ'য়ে।



ওরা বেশ আরামছে গল্প গুজবে ব্যস্ত, ওদের তো আর আমার জন্যে চিন্তা ভাবনা নেই। ওরা বন্যজন্তু দেখ্‌লেও ভয় পায় না। আবার আর একদিকে আমার বন্ধুদের জন্যেও তত ভাবনা নেই।

আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখ্‌ছি যে কোথায়ও কোন নিশানা পাওয়া যায় কিনা। আমরা যে যায়গাটায় ব'সেছিলাম, সেই যায়গায় আমাদের ঠিক পেছনে একটা ছোট পুকুর, তার চারপাশেই অনেকগুলি ছোট বড় গাছ। তবে আগাছা বেশি নেই, অনেকগুলিই শাল গাছ। গাছগুলি লম্বায় অনেকটা উঁচু হ'য়ে প্রায় আকাশের সাথে মিশেছে। কিন্তু গাছের গোরার দিকটা ঠিক যেন একখানি ডালের মত। পুকুরটার জল একেবারে কালো হ'য়ে গিয়েছে। গাছের পাতাগুলিও সেই জলের সঙ্গে মিশে গেছে।

আমি সেই পুকুরটার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখ্‌তে পেলাম,—অনেকগুলি কচ্ছপ তাদের মাথাটাকে উঁচু করে হাঁ করে আমাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। হয়ত আমাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, না হয় মিতালী পাতাবে।

এই রকমেরই একটা কিছু মতলব আঁটছিলো বলে মনে হল।

ডুখন্‌কে দেখিয়ে দিতেই সে একলাফে উঠে পড়ল, আর চীৎকার করতে করতে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

ডুখন্ ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে যে কোন্ দিকে ছুটে যাচ্ছে তা আর বুঝ্‌তে পারলাম না। তবে দেখ্‌লাম যে একটা কচ্ছপ তার পায়ে কামড়ে ধরে আছে। সে আর নড়ছে না।

ডুখনও যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছে আর ছুটাছুটী করছে।

—আমি আর কি করি?

ছুটে গিয়ে ডুখনের পা থেকে কর্চ্ছপটাকে টেনে ফেলে দিলাম।

এদিকে সেই পুকুর থেকে প্রায় তিন-চারশ কচ্ছপ একসঙ্গে জড়ো হ'য়ে ডুখনের পিছে পিছে ছুটে চ'লেছে।

আমি যেই সেই কচ্ছপটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারি, অমনি সবগুলি কচ্ছপই সুর্ সুর্ করে আবার তাদের আড্ডায় যেতে লাগ্‌ল।

—আমরাও অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

—তারপর—

আবার রওয়ানা হ'লাম সেই আগুণের কুণ্ডের খোঁজে।

এবার আর বেশী দূর যেতে হ'ল না।

ছুখন্ ও ভুটিয়া আগে আগে চলেছে, আমি মাঝখানে, আর পেছনে সেই আগন্তুক বন্ধু দু'টী।

ছুখন্ পিছন ফিরে আমায় যে কি বল্লে, আমি তা'র কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না।

সাম্‌নে কয়েকপা এগোতেই দেখি যে একটা যায়গায় একখানা ডাল পোতা রয়েছে। সেই ডালখানার গোড়ায় মাটীর ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

আমি কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারলাম না।

বোধহয় কোনও লোককে সৎকার করা হ'য়েছে—আশে পাশে পোড়া কাঠও রয়ে গেছে।

সেই ডালখানার সঙ্গে জড়ান একখানি রুমাল, রুমালখানি খুলে দেখি যে তাতে প্রতুলের নাম লেখা রয়েছে—আমার চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল বেরিয়ে পড়ল।

ওরা সকলেই উৎসুক নেত্রে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

আমি আর কান্না চেপে রাখ্‌তে পারলাম না, ওদের দেখ্‌ছি চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমরা কেউ ঠিক থাক্‌তে পারলাম না, সকলেই সেইখানটায় ব'সে পড়লাম।

শোক ক'রে আর লাভ কি? মাটী খুঁড়লেও তো

বন্ধুকে পাওয়া যাবে না। খানিকক্ষণ প্রতুলের জন্যে কেঁদে কেঁদে হঠাৎ আমার মনের কোণে—খটাং করে একটা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল।

প্রতুল যে মরেছে তারও তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই। অমরও তো মরতে পারে। আর দু'জনে মরলেই বা এমনি একটা নিশানা রাখবে কে?

আমার মনে হ'ল যে দু'জনের একজনে মরেছে। অপরটী কাছেই কোথায়ও আছে।

কি যে করব কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারছি না।

এদিকে দুখন্‌ ও ভুটিয়ারই হ'ল মুস্কিল, সেও ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারছে না। তাই আমায় কি যেন বল্‌তে যাচ্ছে, এমন সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল বরাবর উত্তর দিকে।

আমরা সবা-ই সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম। দুখনও যেতে চাইলে, কিন্তু আমি তাকে ছেড়ে দিলাম না। কি জানি যদি আবার কোন বাঘ ভাল্লুকের মুখে পড়ে। আমাদের সঙ্গের সেই পাহাড়িয়া লোকদু'টীকে ওর পেছন পেছন ছুটতে ব'লে দিলাম।

আধঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই পাহাড়িয়া লোক দু'টীর একটী ফিরে এল।

আমার তখন আনন্দ দেখে কে? আমি সেই পাহাড়িয়া বন্ধুর সাথে ছুটে চল্‌লাম প্রতুলের উদ্দেশে।

প্রতুলের কাছে যেতেই সে হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে ফেল্লে অমরের জন্যে।

উভয়েই উভয়কে জড়িয়ে ধরলাম। এই অল্প দু'চার দিন ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে দেখা পেয়েও মনে হ'ল যে কত বছর কত যুগ পরে দেখা হ'ল প্রতুলের সাথে। খানিক-ক্ষণ চল্‌ল আমাদের পরস্পরের বিপদ আপদের কথা।

"ভাই। এখন বাড়ী ফিরে চল, আমাদের বেড়াবার সখ মিটে গেছে।"

প্রতুলের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আর কোনও রকমের ইচ্ছে আমার নেই। বেড়াবার সাধ আমারও পূরণ হয়েছে।

আমাদের লাভ হ'ল ঐ একটা হরিণশিশু, দুটো সিংহের বাচ্চা, একটা বন্দুক, আর রিভলভার।

তখন ও ভুটিয়া আমাদের যেতে দিতে চাইছে না, তারা তাদের অনুরোধ জানালে—তাদের বাড়ী যাওয়ার জন্যে।

প্রতুল রাজী হ'ল।

তের

দুখনদের অনুরোধকে আর উপেক্ষা ক'রতে পারলাম না, তাই তাদের কথামত আবার ফিরে যেতে হ'বে তাদেরই বাড়ীতে।

এবার আমরা ছ'জনে একত্র হ'য়েই চল্‌লাম।

আমাদের আর বেশী দূর হেটে যেতে হ'লনা। খানিকটা দূর গিয়েই সেই নদীটিকে দেখ্‌তে পেলাম। এবারে আমরা যে যায়গায় এসে পৌঁছেছি। সেই যায়গাটার নদীটা চওড়ায় বিশ পঁচিশ হাতের বেশি

হবে না। তবে নদীর অপর পাড়ে বেশ সারি সারি নানারকমের গাছ গাছড়া দেখ্‌তে পেলাম। সেই গাছ গাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে আবার খানিকটা ক'রে জলাভূমিও দেখা যাচ্ছে।

নদীর পাড়ে এসেই আমি ও প্রতুল ব'সে পড়লাম। আমরা আর হাট্‌তে পারছি না। আমাদের শরীর ও মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, একটু ঘুমুতে পারলে যেন বেঁচে যাই—এমন মনে হচ্ছিল।

কিন্তু কি করব?—কোনই উপায় নেই। বাড়ীতে ফিরে গেলেই ঠিক হ'ত, কিন্তু ওদের একান্ত অনুরোধ যে ওদের বাড়ীতে গিয়ে আমরা সকলে মিলে একটু বেশ আমোদ ক'রে নেই।

"যা হয় হ'বে, আর মন খারাপ ক'রে লাভ কি?"

প্রতুল বল্‌লে—আমি যেন সে কথা শুনেও শুন্‌ছিনা, সেই নদীর অপর পাড়েই তাকিয়ে দেখ্‌ছি।

তখন বেলাও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, সূর্য্যদেব পশ্চিমে হেলিয়ে পড়েছেন।

সেই নদীটি উত্তর-দক্ষিণ দিকে বরাবর ঠিক সোজা-সুজি ভাবেই এগিয়ে গিয়েছে। সূর্য্যদেব তখন আমাদের পিছনে পড়ে রয়েছেন, এমনকি বোধ হয়

আমাদের দিকে একটু ভ্রুকুটী করেই চলে যাচ্ছিলেন। নদীর অপর পাড়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যদেবের শেষ কিরণটুকুও দেখা যাচ্ছে।

গাছগুলিও যেন সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহের ওপর দিয়ে একটু বিশ্রামের আয়োজন করছিল। আমি কেবল এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছি। কোনও রকমের জন্তু জানোয়াড আমার চোখে পড়ল না। সূর্য্যদেবের অধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে।

"বিনয়। ওপাড়ে ঐ গাছটার ফাঁকে একটী ছোট ছেলেকে দেখতে পারছিস না।"

এইবারে প্রতুলের কথাকে আর উপেক্ষা করতে পারলাম না।

আমি একদৃষ্টে সেই ছোট্ট ছেলেটীর দিকেই তাকিয়ে রইলাম। ছেলেটীর পড়নে লেংটী ছাড়া আর কিছুই নেই। গায়েও কোন জামা নেই। কেবল হাতে একটী তীর ধনুক। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আস্তে আস্তে পা ফেলে ওপর দিকে নজড় রেখে চলেছে।

আমার মনে হ'ল যেন ছেলেটী পাখী শিকার করবার মতলবে আছে। পিছন ফিরে দেখি যে দুখন, ভুটিয়া ও সেই পাহাড়িয়া দু'টীর কেউ-ই আমাদের কাছে নেই।

প্রতুলকে একটা ধাক্কা দিয়ে সজাগ ক'রে দিতেই সে উঠে পড়ল।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম, যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়, ওদের কাউকেই দেখ্‌তে পেলাম না।

"ওরা বোধ হয় সেই নৌকার খোঁজে গেছে।"

আমার মন যেন বল্‌ছে যে আমরা আবার কোন্‌ বিপদে পড়ি। প্রতুলকে কোথায়ও যেতে দিলাম না। একান্তই যদি ওরা কেউ ফিরে না আসে, তবে যা হয় একটা উপায় ঠিক করে নে'য়া যাবে।

এমনি ক'রে কত রকমের ছাই ভস্ম দুশ্চিন্তার ভেতরে আমাদের দু'জনেরই খানিকটা সময় কেটে গেল। ওরা এসে পড়ল, যদিও হঠাৎ আমাদের দুশ্চিন্তাটাকে কমিয়ে দিলে। আমি যে নৌকায় দুখনদের সাথে এসেছিলেম, সেই নৌকায় চড়ে ওরা চারজনেই এল।

আমরা সকলেই নৌকায় উঠে বসে পড়্‌লাম।

এখন আর আমাদের কোন ভয় ভাবনা নেই। ওরা চারজনেই বেশ তালে তালে নৌকা চালিয়ে নিয়ে চলেছে। নৌকা চালাবার ভঙ্গিটী এমন সুন্দর লাগ্‌ল

যে আমরা দু'বন্ধুই আমাদের সকল বিপদ আপদের কথা একেবারেই ভুলে গেলাম।

ভুটিয়া একটা গান গাইল—যদিও গানের একটী পদও আমরা বুঝ্তে পারলাম না। তবুও ভালই লাগ্‌ল।

* * *

গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা দু'বন্ধুই ঘুমিয়ে পড়লাম, কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলাম জানি না। যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন চারদিকেই অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কোন্‌দিকে যে চলেছি তা আর বোঝা গেল না।

নদীর দু'তীরেই বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়, আর তার ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা মাত্র ছ'টী প্রাণী। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে দু'জনে বেশ ঢুল্‌ছে। ঘুমের ঘোরে বোধহয় কোন স্বপ্ন দেখ্‌ছিল। তুখন্‌ও ভুটিয়া বেশ তালে তালে ঝুপ্‌ ঝাপ্‌ শব্দ ক'রে নৌকাখানিকে চালিয়ে নিচ্ছে। প্রতুলও বেশ সটান হ'য়ে নৌকার মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে।

—তখন রাত প্রায় বারটা হ'বে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট আওয়াজ আমার কানে এসে ধাক্কা মার্‌ল। তুখনও বোধহয় শুন্‌তে পেরেছে, তাই

আমার নিষেধ করার আগেই সে দাঁড় টানা বন্ধ ক'রে দিলে।

এইবার সেই শব্দ বেশ স্পষ্টই শুন্‌তে পেলাম—আমার মনে হ'ল যেন আট দশ খানা নৌকা একসঙ্গে দাঁড় টেনে আমাদের কাছেই এগিয়ে আস্‌ছে।

—প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন সেই শব্দ স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল।

দেখ্‌লাম যে ত্থখন্ নৌকাটাকে ঘুড়িয়ে নিলে, এবং এক কিনারায় একটা গাছের গোড়ায় লঙ্গর কর্‌লে।

জলের ছল্ ছল্ শব্দ, নিশাচর পাখীদের কলরব, নদীর কিনারায় ঝোপ্ ঝাপের মধ্য হ'তে জন্তু জানোয়াড়ের ডাক—আবার একটা অজানিত বিপদের আশঙ্কা—এক সঙ্গে আমাকে একেবারে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম।

এখন যে কি করা উচিত কিছুই ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারলাম না।

ত্থখন্ আমায় ইসারা করলে রিভলভারটী ঠিক্ ক'রে ধরতে।

এদিকে সেই নৌকাগুলি আমাদের একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

তুখন্ তার হাতের বর্ষাটাকে ঠিক বাগ ক'রে ধ'রেই আছে—ভুটিয়াও তাই।

—আমি পড়লাম মহামুস্কিলে।

এখন প্রতুলকে সজাগ ক'রে তুল্‌তে অনেক সময় লেগে যাবে।

তাই চুপ্ করে নৌকার ভেতরেই চাপ্‌টী লেগে পড়ে'রইলাম।

প্রথমে দেখ্‌লাম যে তু'খানা ছিপ নৌকা ঠিক পাশাপাশি হ'য়ে আমাদের বিশ পঁচিশ হাত তফাতে এসে দাঁড়াল।

তু'নৌকায় একত্রে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক হবে। অন্ধকারের মধ্য হতে স্পষ্ট বোঝা গেল না ওদের হাব ভাব।

হঠাং বিশ পচিশটা মশাল দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল।

এবার আর আমাদের রক্ষা নেই ভেবে আমরা একসঙ্গে ছ'বন্ধুই প্রস্তুত হ'য়ে নিলাম। প্রতুলকে সজাগ করে দিতেই সেও বন্দুকটী ঠিক করে নিলে।

আমাদের পাহাড়িয়া বন্ধু তু'টী নৌকা হতে একলাফে

তীরে নেমে পড়ল। পাড়ে নেমেই একজনে প্রতুলকে, আর একজনে আমাকে টেনে নামাল।

আমরা চারজনেই একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

আমার কিন্তু এতে ওদের ওপরই বড্ড রাগ হল। —দেখা যাক্ কি হয়।

আমার আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে একদল ডাকাত আমাদের একেবারে কাছে এসে পড়েছে। এদের সাথে আমরা ছ'টী প্রাণী কিছুতেই পেরে উঠ্‌ব না। তাই আমরা ঝোপের আড়ালে থেকে ওদের দিকেই নজর রাখলাম।

ওরা বোধ হয় আমাদের দেখ্‌তে পায় নি। তাই খানিকবাদে আবার নৌকা ছুটে চল্‌ল—যেন তীরের মত।

দুখন্ ও ভুটিয়া ততক্ষণে নৌকা হতে নেমে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

একখানা ছবির মত প্রায় তিন চারশ' ডাকাতসহ আট দশখানা নৌকা আমাদের একেবারে পাশ দিয়েই চলে গেল।

আমাদের সকলেরই তখন প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছিল।

—যাক্ ভালয় ভালয় সে রাতটা সেখানেই কোনও রকমে কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন ভোরবেলায় দুখন্‌দের বাড়ীতে পৌঁছালাম। সেখানে হ'ল একটা বিরাট রকমের ভোজের আয়োজন।

দুখন এনে হাজির করলে বড় বড় দুটো মাছ। আরও ছোট ছোট অনেকগুলি মাছ।

আমরা সকলে মিলে বেশ উৎসব করে খেলাম।

সে দিনটা বেশ আমোদেই কেটে গেল।

পরদিন ভোর বেলায় পাহাড়িয়া বন্ধু দু'টী তাদের বাড়ী চলে গেল। সিংহের বাচ্চা দু'টীকে তাদের দিয়ে দিলাম।

দুখন ও ভুটিয়া আমাদের পৌঁছে দিয়ে এল দার্জ্জিলিং। সেখানথেকে ট্রেণে আমাদের বাড়ী পৌঁছেছি।

প্রথমেই প্রতুলদের বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লাম পরে সেখান থেকে আমাদের বাড়ী যাব।

তখন রাত প্রায় আটটা হবে। প্রতুলের মা আমাদের জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন, তাই তিনিও একটা ভাল রকমের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

পরিশিষ্ট

এক

প্রতুলদের বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফির্‌তে রাত অনেক হয়ে গেছে।

তখন রাত প্রায় বারটা হবে। প্রতুল আমাকে নিষেধ করেছিল। আমি আমার মার সাথে দেখা করবার জন্যেই উৎসুক হয়ে উঠেছি।

প্রতুলের কাছ থেকে বিদেয় নেবার সময় ঘুমে তার চোখ দুটো বুজে আস্‌ছিল।

আমিও কোনওরকমে বিদায় নিতে পারলেই বাঁচি, এই ভেবে তাদের বাড়ীর সদর দরজা পার হয়ে বড় রাস্তায় পা দিয়েছি, তখন রাস্তায় দু'একজন পুলিশ ছাড়া আর কোনও লোকজনই হাটা চলা করছিল না।

ভয় ও আশঙ্কা দু'টোই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে পাহাড়ের সেই সকল বন্য জন্তুদের কথা, আবার আর একদিকে দুখন্‌ ও ভুটিয়ার কথা, আমার মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

প্রতুলদের বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ী একেবারে কাছে নয়, খানিকটা দূর হবে। হেটে আর যেতে পারছি না। সারা গা যেন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে।

কয়েক পা বাড়াতেই একটা হৈ চৈ শব্দ শুনতে পেলাম।

হৈ চৈ শব্দ যেদিক দিয়ে আস্‌ছিল সেদিকে দৌড়ে যেতেই—আমি দেখ্‌তে পেলাম যে আমার বুড়ো বাবা একটা ক্যাসবাক্স মাথায় করে ছুটে চল্‌ছে, আর পিছন দিক থেকে অনেক লোক "চোর" "চোর" বলে ছুটে আস্‌ছে।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়ে গেছি, আমার হাত পা যেন ভেঙ্গে চূড়মার হ'য়ে গেছে।

পিতা আমার গুরুর গুরু, তাকে চোর বলে ধরে নিয়ে যাবে আমার সাম্‌নে—এ আমি হ'তে দেব না।

আমি দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ধরে ফেল্লাম। তাঁর মাথা থেকে ক্যাসবাক্সটী কেড়ে নিয়ে আমি নিজেই অপর দিকে ছুটে চল্‌লাম।

যে লোকগুলি "চোর" "চোর" বলে দৌড়ে আস্‌ছিল, তারা আমাকে ধরে ফেল্‌লে।

বেশ দু' এক ঘা উত্তম মধ্যম দিতেও কসুর করেনি।

আমি নির্ব্বিবাদেই সব সহ্য করে গিয়েছি। আমি ধরা পড়্‌লাম।

চোর বলে আমায় জেলে নিয়ে গেল। আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় বাবা তাদের কত কাকুতি মিনতি করে বল্‌লেন যে আমি চুরি করিনি, তিনিই অভাবের তাড়নায় চুরি করে এনেছেন। পুলিশেরা তার কথায় কানও দিলে না, আমায় মারতে মারতে নিয়ে গেল।

পাহাড় থেকে ফিরে এসে মার সাথে আর দেখা হ'ল না।

বাবার কাছে আমার কথা শুনে তিনি পড়লেন মূর্চ্ছা। সেই মূর্চ্ছাই শেষে রোগের সামিল হ'য়ে দাঁড়াল।

—এদিকে—

প্রতুলকে আমি বোঝালাম কত কি? তবুও সে মান্‌তে চায় না যে আমিই চুরি করেছি। সে চায় যে আমি নিজে মুখেই বলি আমি কি এমনই বোকা যে আমার বাবা চুরি করেছিলেন, তাই বল্‌তে যাব বন্ধুর কাছে।

প্রতুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল যে সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌বে যে আমাকে খালাশ করতে পারে কিনা। টাকা পয়সার তো অভাব নেই। ও ইচ্ছে করলে আমাকে খালাশও কর্‌তে পারে।

প্রতুল চলে যাওয়ার পর আমার মনে পড়্‌ল বাবার মুখখানা।

দারিদ্র্যের ছাপ লেগে তাঁর মুখখানা একেবারে মলীন হ'য়ে গেছে। মনে পড়ে গেল আগের দিনের শেষ দেখা, বাবার চোখ দিয়ে অজস্র ধারে জল পড়্‌ছিল।

তখনও তিনি ধারণা করতে পারেন নি যে আমি অতটা এগিয়ে যাব। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন যে আমি নিজেকেও বাঁচিয়ে নেব।

কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছে পূরণ হতে দেইনি আমি নিজে ইচ্ছে করেই।

অভাবের তাড়নায় মানুষ কত বড় একটা জঘন্য কাজে হাত দিতে পারে এ ধারনা আমার ছিল.না। আজ চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ছে আমাদের বিরাট সংসারের রুদ্র মূর্ত্তি।

দাদারা কেউ এক পয়সাও আয় করেন না। বাবা সামান্য কয়েকটা টাকা পা'ন পেন্সন-স্বরূপ।

তাতে অতি কষ্টে চল্‌লেও এতগুণো লোকের দু' বেলা চলে না।

* * *

—মাস খানেক পরের কথা।

বিচারের দিন প্রতুল আমার পক্ষে একজন উকিল নিয়ে এল। আমি কিন্তু নিজেই স্বীকার করলাম যে আমি-ই চুরি করেছি।

বিচারক তিন বছর জেল দিয়ে দিল।

জেলের কয়েদী জীবনটা আর কাটিতে চায় না। আইন শুধু শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কিন্তু মানুষের মনটাকে ত আর আটকে রাখতে পারে না।

আমার মনটা পড়ে রইল আমাদের সেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানির কোণে। গরীব মা বাপের কথা সব সময়ই আমার মনের কোণে উঁকি মারত।

*　　　*　　　*

এমনি করে তিনটী বছর কেটে গেল।

যেদিন আমার খালাশ হওয়ার কথা, সে দিন জেলখানার দরজা থেকে বের হয়ে আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

কল্‌কাতার অগণীত জনসমুদ্রের মাঝে আমি পথ করে চলেছি। পথে একজন পুরাতন পরিচিত বন্ধুর সাথে দেখা। সে তখন বি, এ পাশ করে সবে মাত্র একটা আফিসে ঢুকেছে।

আমাকে দেখেই সে আদর করে নিয়ে গেল তার মেসে।

বিকেল বেলায় মেস থেকে রাস্তায় বের হতে যাব এমন সময় প্রতুল এসে হাজির।

প্রতুলের কাছে শুন্‌লাম পিতার মৃত্যু সংবাদ, তারপর আমার দাদাদের কথা, মার দুঃখ কষ্টের কথা।

"দেখ্‌ বিনয়, আজই তোকে দেশে যেতে হবে, তোর মা তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে একেবারে মরণ দশা আর কি?"

প্রতুলের কথার কোনই উত্তর দিলেম না। ঠায় চুপ করেই রইলেম।

"কি? উত্তর দিচ্ছিস্‌ না যে।"

"আমি এখন বাড়ী যাব না।"

"তা'হলে তোর এখন কি করবার মতলব। সে মতলবটা একবার শুন্‌তে পারি কি?"

"আমার ইচ্ছে যে আমি এখন পড়াশুনা ক'রে অন্ততঃ বি, এ, টা পাশ করি।

আমার মনের ইচ্ছেটা প্রতুল শুন্‌লে।

শুনে কিছু সময় ভেবে চিন্তে পরে সেদিনকার মত আর কোন কথাই বল্‌লে না।

পরদিন প্রতুল চলে গেল বাড়ী, যাওয়ার সময় আমাকে টাকা দিয়ে গেল, আর বলে গেল কলেজে ভর্ত্তি হতে।

দুই

সেই থেকে আর বাড়ী মুখো হইনি।

বি-এ, পরীক্ষার ফল বের হয়েছে, আমাদের মেসের একটী ছোক্‌ড়াই আমাকে খবর দিয়ে গেল ।

পাশ করেছি সত্যি কিন্তু সে সংবাদটা শুনে মনে আনন্দ হয়নি একটুও।

পাশ করবার পর আর বেশী দিন আমায় বসে থাক্‌তে হল না।

এক সওদাগরী আফিসে চাকরী জুটে গেল।

*   *   *

চাকরীর জীবনে প্রথম মাসের মাইনের টাকা সবই বাড়ী পাঠিয়ে দিলেম।

সেই হতে প্রত্যেক মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে আমার মার কোন কষ্ট না হয়।

এমনি ভাবে প্রায় দু'বছর কেটে গেছে। বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই দেখে বন্ধুরা আমায় কত রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

আমিও তাই নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেম।

বাবা তো অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। মা ও আমার এখন বুড়ো হ'য়েছেন, মাকে দেখ্‌বার একটা প্রবল আগ্রহ থাক্‌লেও বাবার কথা মনে উঠ্‌লে আর বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না।

অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে তিনি মারা গেলেন।

পাহাড়েব চূড়ায়

আমি যখন ট্রেণ থেকে নেমেছি. তখন ভোব হয়ে গেছে। শীতকালের সকালবেলা কুয়াসায় সমস্ত সহরটীকে যেন অাঁধার করে রেখেছে।

সেই কুয়াসার মধ্য দিয়ে পথ কবে নিয়ে আমাদেব বাড়ীর উদ্দেশে চলেছি। ষ্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী ছিল প্রায় এক মাইল দূরে, বাড়ীর কাছাকাছি গিয়েছি এমন সময় আমার বুকটা দূর দূর কবে কেঁপে উঠ্‌ল।

আমি যেন আর এক পাও হাট্‌তে পারছি না। একটা অজানিত বিপদের আশঙ্কায় আমার হৃদকম্প হবার উপক্রম কর্‌ছিল।

খুব ধীরে অথচ সন্তর্পনে এক পা দু'পা করে একেবারে কাছে গিয়ে পড়েছি।

—কিন্তু একী?

বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। যে যায়গায় আমাদের বাড়ী ছিল, সে যায়গায় কতকগুলি ইট পড়ে রয়েছে, বোধ হয় নূতন পাকা বাড়ী তৈয়ারী হবে।

এর কারণ কি? কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না। রাস্তায় একজন অপরিচিত লোককে দেখে তার কাছে জিজ্ঞেস্ করলাম আমাদের বাড়ীর খবর।

তিনি যা বল্‌লেন তাতে আমায় যেন পাগল করে তুলেছে। দাদারা বাড়ীখানি বিক্রী করে ভাড়াটে বাড়ীতে থাকেন, সে ভদ্রলোক আমার দাদাদের ঠিকানা জানেন না।

সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়িয়ে না থেকে চল্‌লাম দাদাদের খোঁজে।

পাগলের মত ছুটে ছুটে এ গলি সে গলি ঘুরে একটা বাড়ীর সাম্‌নে গিয়েই আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম।

একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা চোখের সাম্‌নে ঘট্‌লে যেমন হয় আমারও তেমনি হয়েছিল।

আমার বুড়ো মা একটা বাড়ীর বারান্দায় ঝাঁট দিচ্ছেন।

বাড়ীটি বড়লোকের বাড়ী বলে মনে হল। সদর দরজায় দারওয়ান বসে রয়েছে।

দারওয়ানকে এক ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লুম, মা'র কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস্‌ করলাম এর কারণটা।

দাদারাই বা কোথায়? মাসে মাসে ঋতিমত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি, তাতে কিনা মা আমার দাসীবৃত্তি করে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্‌ছেন।

রাগে, দুঃখে আমার সারা গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, কি যে করব কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারলুম না।

মা আমায় কিছুই বল্‌তে পারলে না। তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়্‌ছিল।

"কতদিন এখানে আছ ?"

তবুও মা আমার নীরব, দারওয়ান বল্‌লে যে আমার মা নাকি সে বাড়ীতে প্রায় এক বছর কাজ কর্‌ছে।

মাকে প্রণাম করে বেড়িয়ে পড়লাম দাদাদের খোজে, সহরময় ঘুরে ঘুরে কোথায়ও পেলাম না, যখন একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন দেখ্‌তে পেলাম বড়দা'কে রাস্তায়। বেশ খোস মেজাজেই পথ চল্‌ছিলেন, গায়ে একটা দামী গরম জামাও রয়েছে।

দূরে থেকে দাদাকে দেখ্‌ছি আর ধীরে ধীরে আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় এক উষ্ণ রক্ত বয়ে চলেছে।

রাগ ও দুঃখ এক সঙ্গে একত্র হয়ে আমাকে উন্মত্ত করে তুলেছে।

হোক্ না সে বড় ভাই, তবুও সেওতো মায়েরই সন্তান। আমি টাকা পাঠাতাম যাতে আমার মা'র কোন কষ্ট না হয়। আর তিনি কিনা সেই টাকায় নিজের

জামা, কাপড়ের সংস্থান করে মাকে পাঠালেন দাসীর কাজে। মা তার পেটের সংস্থান করে নেবেন দাসী-বৃত্তি করে, আর তিনি নিজে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বেন।

—এ হ'তে পারে না। এ অসম্ভব! অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন দাদা। এই প্রকৃতির লোক কখনই আমার দাদা হতে পারেন না, এ যে পশুর চেয়েও অধম।

রাগের চোটে আমার চোখ দিয়ে যেন আগুণ বেড়িয়ে আস্‌ছে।

—আমি আর দাড়িয়ে থাক্‌তে পাচ্ছি না। চট্‌ করে দাদার সাম্‌নে গিয়ে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লাম—"মা কোথায়?"

আমার কথার জবাব দেয়া তো দূরের কথা—তিনি তখন ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করেছেন।

এতে আমার রাগের মাত্রা আরও বেড়ে উঠ্‌ল। তাই দাদার মাথার চুলগুলি খুব শক্ত ক'রে ধরে ফেল্‌লাম।

রাগের চোটে আমার গায়ের সমস্ত শক্তি তখন চার-গুণ বেড়ে উঠেছিল।

আমি টাকা পাঠিয়েছি, সেই টাকা নিজে খরচা করে মাকে কষ্ট দিয়েছ, এর শাস্তি তোমায় পেতে হবে।

বন্য বাঘ সিংহে তোমায় টু-ক্-রো টু-ক্-রো করে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌বে, তাহলে এর উপযুক্ত শাস্তি হবে।

—তাই—

আমি নিয়ে চল্‌লাম দাদাকে টে-নে হেঁ-চ্‌ড়ে একেবারে সেই **পাহাড়েরই চূড়ায়,** যেখানে অমরকে রেখে এসেছিল প্রতুল। এমনিভাবে তাকে টেনে নিয়ে চলেছিলেম যে, সহরের সমস্ত লোক একত্র হয়েও আমায় রোধ করতে পারলে না।

শীঘ্রই বাহির হইবে

গ্রন্থকার প্রণীত

১।	ভূতের পুকুর	দাম ।০
২।	লাস-কাটা ঘর	দাম ।০
৩।	যাদবের যাদুবিদ্যা	দাম ॥০
৪।	ছোট ডিমের মাম্‌লেট	দাম ।৵০
